মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাস

গোলাম মহিউদ্দিন

converted to *pdf* By-

Tanvir Ahmad

(RoNy)

2K4, *Dept. of Mechanical Engeneering*

KUET

লেখকের নিবেদন

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর সালটিতে লেখক-সাংবাদিক অংশ গ্রহণকারীরূপে আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের বেশ কিছু বিবরণ এ যাবৎকাল আমি লিখে প্রকাশ করেছি। ওসবের দুয়েকটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ এখানেও করছি। একান্তভাবে দেখাশোনার ঘটনা।

একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মে-জুনের কয়েক সপ্তাহব্যাপী এক সময়কাল। প্রথমে খরা-রৌদ্রের প্রচণ্ড দাবদাহ। তার পরেই এতদকাল অসময়োচিত প্রবল বর্ষার আগমন। সীমান্ত পারের ভারত ভূমিতে এখন সদ্য আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী শরণার্থীর দলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ সমগ্র পরিবারকে নিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকজনেরই প্রথম দিকে নিজ নিজ আহার বাসস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। হতভাগ্য শরণার্থীদের অধিকাংশই অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বর্ষা বাদলে ভিজে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মহামারীর আকারে কলেরা-ডায়রিয়া শরণার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন অসংখ্য শরণার্থীদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছিল।

বিশ্বখ্যাত ইংরেজী 'নিউজ উইক' পত্রিকার তরুণ রিপোর্টার টনি ক্লিফটনকে কলকাতা থেকে শরণার্থী ক্যাম্পসমূহে খবর সংগ্রহের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাবার কালে, আমাদের কলকাতা-বারাসত-কৃষ্ণনগরের যাত্রা পথের দু'ধারে সীমান্ত অঞ্চলে নারী শিশুসহ রোগ অনাহারের শিকার অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ওসব শরণার্থীর মৃতদেহের সংবাদ চিত্র দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তখন প্রকাশিত হতেও দেখা গিয়েছিল।

পেশাগত সাংবাদিকতার এসব দায়িত্ব পালনকালের সেই সময় একদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারত ভূমিতে ইতিপূর্বের কিছুটা সুসংগঠিত এক শরণার্থী ক্যাম্পে উক্ত টনি ক্লিফটনসহ আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম, সেদিনের মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই বেশ কিছুসংখ্যক

তরুণ-যুবক (শরণার্থী) তাদের তরতাজা দেহ নিয়ে গোল হয়ে আয়েশের সঙ্গে বসে তাস পেটাচ্ছে।

শরণার্থী ক্যাম্পটির ভারতীয় সরকারি চাকুরিজীবী প্রধান সুপার বাবুকে আমরা বিস্ময়াভূত হয়েই উপরোক্ত তরতাজা জোয়ান জোয়ান ছেলেদের তাস খেলা নিয়ে তখন আয়েশের সঙ্গে সময় কাটাবার বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি এক অনুকুল মনোভাব প্রদান করেই তখন জবাবে বলেছিলেন, এই ছেলেরা (শরণার্থী ছেলেরা) মুক্তিযুদ্ধে যেতে চায় না। এদের আমরা যেতে বললে আমাদের বলে যে, বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেকার দেশ) স্বাধীন হলে তো আরেকটি মুসলমান প্রধান দেশরূপেই ওটির অভ্যুদয় ঘটবে। এর জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবনের চরম ঝুঁকি আমরা নেবো কেন?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কাজকর্মের মাঝে কিছু অবসর সময় পেলেই কলকাতা চৌরঙ্গীর টাওয়ার হাউস নামক বহুতল বিশিষ্ট ভবনটির তিন তলায় বিদেশী সংবাদ সংস্থা ইউ. পি. আইর কলকাতাস্থ ব্যুরো প্রধান মিঃ এ. কে. দাসের অফিস ঘরটিতে এক একটি বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডায় হাজির হতাম। কলকাতার সেই আড্ডাটিতে সস্ত্রীক বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক- জনাব জিল্লুর রহমান, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী সম্পাদক- অধ্যাপক আঃ খালেক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা সাংবাদিক উপস্থিত থাকতে দেখেছি।

একাত্তরের অক্টোবরের দূর্গাপূজার সময়কালটিতে দিল্লী থেকে কয়দিনের জন্য কলকাতায় এসেই এক বৈকালিক আড্ডায় সেখানে হাজির হয়েছিলাম। সস্ত্রীক জনাব জিল্লুর রহমান ছাড়া আড্ডার নিয়মিতদের অন্য আর কেউ সেদিন তখন সেই টাওয়ার হাউসের আড্ডাক্ষেত্রে উপস্থিত হননি। সেখানে সেদিন আমার সাক্ষাত পেয়েই জনাব জিল্লুর রহমান এক আবেগ জড়িত কণ্ঠে তখন বলেছিলেন ঃ ভারতের দিল্লীর সরকারি কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী ফৌজীদের ভয়ানক দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ভেবেছেন। আর তাই তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যুদ্ধে নামতে যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত দেখছি যে, এতে আমাদের দেশ বাংলাদেশে এরা ফিরে আসার কোন ব্যবস্থাই এখন করতে পারবেন না। আমাদের অবশিষ্ট সারা জীবনটাই হয়তো এদেশে (ভারতে) শরণার্থীর জীবন-

যাপন করতে হবে। (বাংলাদেশের বুকে তখনই অর্থাৎ ঘোর বর্ষার নদীনালার পানি ভরাট অবস্থার মধ্যেই অনতিবিলম্বে বাড়িয়া সেনাভিযান শুরু করবার জন্য তাজউদ্দিন প্রমুখ মুজিবনগর সরকারের দিল্লীতে আকুলভাবে দেন দরবার করে ফিরবার তখনকার খবরও আমাদের প্রায় সবারই জানা ছিল। আর ভারতের সামরিক হাই কমান্ডের বিষয়টিতে স্ট্রাটেজী যা-ছিল সেসব কথা পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ ও ইস্টার্ন কমান্ডের লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা প্রকাশ করেছেন। তখনকার পরবর্তী আসন্ন শুকনো শীতের মৌসুমে বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় সেনাভিযান পাঠাবার পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা- যা ইতিপূর্বে আমরা নানাভাবে লিখে প্রকাশ করেছি)।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জিত হবার পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসবার প্রথম সুযোগেই কলকাতা থেকে বনগাঁর স্থলপথে খুলনা হয়ে জলপথের রকেট স্টীমার সার্ভিসযোগে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। খুলনা-ঢাকা নদীপথের ইতিপূর্বের যুদ্ধকালীন পেতে রাখা মাইন পরিস্কার করতে ওই পথের ২/৩ সপ্তাহকাল সময় লেগেছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকের এক সময়ে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে খুলনা-ঢাকা রকেট স্টীমার সার্ভিস পুনরায় চালু হয়েছিল। ফলে তখনকার জানুয়ারীর প্রথম ক'টা দিন আমাদের যশোর-খুলনা অঞ্চলেই অপেক্ষা করে দিন কাটাতে হয়েছিল।

খুলনা থেকে রকেট স্টীমার সার্ভিসযোগে ঢাকায় ফিরে আসবার পথে স্টীমারে সহযাত্রীরূপে একজন কেতাদুরস্ত স্যুট পরিহিত বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর কথায় জেনেছিলাম, তিনি সরকারি সিভিল এভিয়েশনের একজন পদস্থ টেকনিক্যাল অফিসার ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশোর্ধ ছিল বলে মনে হয়েছিল। (ঐ বিশেষ সময়কালে এক সময় আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধা মামা উইং কমান্ডার এস, আর, মির্জা বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক তথা ডিজি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।)

একাত্তরের ডিসেম্বরে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করবার শেষ মুহূর্তগুলোতে লুটপাট শুরু হয়েছিল। তখন যশোর বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি কে বা কারা খুলে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় চোরা বাজার নামে পরিচিত ক্যানিং স্ট্রীট মার্কেটটিতেই প্রধানত ওসব চোরাই মালপত্র বিক্রয় হতে দেখা গিয়েছিল।

ঢাকা থেকে সিভিল এভিয়েশনের উপরোক্ত টেকনিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন অফিসারদের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী একটি দিনে পিওন ও দুয়েকজন মেকানিক মিস্ত্রীসহ রেডক্রসের রিলিফবাহী বিমানে যশোরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। যশোর বিমান বন্দরে অচল কন্ট্রোল টাওয়ারটিকে মেরামত করে সচল করতে।

খুলনা থেকে স্টীমারযোগে ঢাকার সেই যাত্রাপথে আলাপকালে এক সময়ে বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে সিভিল এভিয়েশনের মার্জিত শিক্ষিত অফিসারটি বললেন ঃ 'আপনারা তো মুক্তিযুদ্ধ করে এলেন। এতে আপনারা সত্যিই কি এদেশটিকে স্বাধীন করলেন ?'

তাঁর কথায় তখন জেনেছি, 'তিনি যশোর বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারটির মেরামতের কাজে এসে এখানকার দুয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন। তখনকার চরমভাবে লুণ্ঠিত যশোর বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পরেই নিজের সেই অফিসের জন্য যথাসম্ভব আসবাবপত্র টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন সেট সবে সংগ্রহ করে অফিসটিতে কিছুটা গুছিয়ে বসেছিলেন। ঐ সময়কালে একদিন মিত্র বাহিনীর দু'জন ভারতীয় সিপাহী সকালে তাঁর অফিস ঘরে এসে প্রবেশ করে এবং তাকে কিছু না বলেই টেবিলে রক্ষিত টেলিফোন সেটটি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। তা দেখেই তিনি বেশ দৃঢ়কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওদের বলেন, 'ওটা আমার অফিসের জন্য প্রয়োজন; রেখে যাও।'

সিপাহী লোক দুটো তখন টেলিফোন সেটটি বিনা বাক্য ব্যয়ে টেবিলে রেখে চলে যায়। ওর কিছু পরেই ভারতীয় সেনা অফিসারের ব্যাজ-ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অবাঙালীকে সঙ্গে নিয়ে ওরা আবার ফিরে এসেছিল। নবাগত লোকটি তাকে নিজের হিন্দুস্থানী ভাষায় ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'আমার এই লোকদের তুমি টেলিফোন সেটটি নিতে বাধা দিয়েছো কেন ?'

ঐ লোকটি তখনই একটানে তার ছিঁড়ে টেলিফোন সেটটি তার সঙ্গী সিপাহীর হাতে তুলে দিলেন– আর ধমকের সুরে তাকে বললেন ঃ 'আয়েন্দা অ্যায়সা মাত কিজিয়ে।' (এ রকম কাজ ভবিষ্যতে আর করবে না।)

খুলনা শহরে প্রবেশের মুখে, শহর উপকণ্ঠস্থ বয়রা সরকারি গার্লস কলেজের তখন সদ্য নির্মিত বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর প্রায় সবরকমের নতুন ঝকঝকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি খুলে মিত্ররূপে সেখানে সদ্যাগতদের সেনা ট্রাকে তুলে ফিরতি পথে রওনা দেবার বেশ কিছু দৃশ্য তো তখন সেখানে স্বচক্ষে আমরাও দেখেছি। ওর পরে দিল্লীতে আরেকবার ফিরে যাবার পরেই সেখানকার বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরে তা নিয়ে এসেছিলাম। আদর্শবাদী মুক্তিযোদ্ধারা লুটপাটে অংশ নেয় না– কিন্তু মার্সিনারী চরিত্রের সেনা সদস্যদের সে বালাই নেই বলে লুটপাটে তাদের অরুচি দেখা যায় না। একাত্তরে আমরা এক একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপেই তা দেখেছি। আর একই সময়কালটিতে দেখেছি ষোড়শ ডিভিশনওয়ালা ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের (ইতিপূর্বে এদের অনেকেই পাক হানাদারদের সহযোদ্ধা ছিল) অশুভ কর্মকাণ্ড-এর অশুভ জের থেকে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়কাল মুক্ত হতে পারেনি।

ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিগত ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে ব্রিটিশ শাসিত বাংলা প্রদেশটিকে, অস্বাভাবিক আকারে হলেও বিভক্ত করে যারা ইতিহাসের অপরাধ করেছেন, একাত্তরে তাদের কেউ যে-বাংলাদেশের সত্যিকার স্বাধীনতার পক্ষের লোকরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হতে পারেন, কোনদিনই তা বিশ্বাস করিনি। কলকাতাসহ ভারতের নানাস্থানে তাদের আয়োজিত সভা সেমিনারে প্রায় সময়ই প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদানকালে সেসব কথা তখনই তাদের মুখের উপর বলতেও দ্বিধাবোধ করিনি। রূঢ় সত্যটিকে এখানেও তুলে ধরেছি।

আর সেই বিদেশী শক্তিটির সহায়তায় নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়াই যে-আওয়ামী বলয়ভুক্ত মুজিববাদীদের তখন একটি 'মুক্তিযুদ্ধ' ছিল তা-ও লক্ষ্য করেছি। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'কাল হতেই তাদের নেতা শেখ মুজিবকে সম্মুখে রেখে নিজের দেশের ক্ষতি করে হলেও তাদের নিজেদের আত্ম-স্বার্থ উদ্ধারের সেই পথযাত্রাটিতেই তাদেরকে দেখেছি। একাত্তরে তাদের সেই পথযাত্রার চূড়ান্ত রূপটিকে দেখেছি।

একাত্তরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার পথযাত্রা থেকে তাদের রাজনীতির চরম ক্ষতিকর রূপটিকে দেখে এসেছি। ভারতে মুজিবনগর সরকারের

তরুণ-যুবক (শরণার্থী) তাদের তরতাজা দেহ নিয়ে গোল হয়ে আয়েশের সঙ্গে বসে তাস পেটাচ্ছে।

শরণার্থী ক্যাম্পটির ভারতীয় সরকারি চাকুরিজীবী প্রধান সুপার বাবুকে আমরা বিস্ময়াভূত হয়েই উপরোক্ত তরতাজা জোয়ান জোয়ান ছেলেদের তাস খেলা নিয়ে তখন আয়েশের সঙ্গে সময় কাটাবার বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি এক অনুকুল মনোভাব প্রদান করেই তখন জবাবে বলেছিলেন, এই ছেলেরা (শরণার্থী ছেলেরা) মুক্তিযুদ্ধে যেতে চায় না। এদের আমরা যেতে বললে আমাদের বলে যে, বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেকার দেশ) স্বাধীন হলে তো আরেকটি মুসলমান প্রধান দেশরূপেই ওটির অভ্যুদয় ঘটবে। এর জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবনের চরম ঝুঁকি আমরা নেবো কেন?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কাজকর্মের মাঝে কিছু অবসর সময় পেলেই কলকাতা চৌরঙ্গীর টাওয়ার হাউস নামক বহুতল বিশিষ্ট ভবনটির তিন তলায় বিদেশী সংবাদ সংস্থা ইউ. পি. আইর কলকাতাস্থ ব্যুরো প্রধান মিঃ এ. কে. দাসের অফিস ঘরটিতে এক একটি বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডায় হাজির হতাম। কলকাতার সেই আড্ডাটিতে সস্ত্রীক বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক- জনাব জিল্লুর রহমান, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী সম্পাদক- অধ্যাপক আঃ খালেক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা সাংবাদিক উপস্থিত থাকতে দেখেছি।

একাত্তরের অক্টোবরের দূর্গাপূজার সময়কালটিতে দিল্লী থেকে কয়দিনের জন্য কলকাতায় এসেই এক বৈকালিক আড্ডায় সেখানে হাজির হয়েছিলাম। সস্ত্রীক জনাব জিল্লুর রহমান ছাড়া আড্ডার নিয়মিতদের অন্য আর কেউ সেদিন তখন সেই টাওয়ার হাউসের আড্ডাক্ষেত্রে উপস্থিত হননি। সেখানে সেদিন আমার সাক্ষাত পেয়েই জনাব জিল্লুর রহমান এক আবেগ জড়িত কণ্ঠে তখন বলেছিলেন : ভারতের দিল্লীর সরকারি কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী ফৌজীদের ভয়ানক দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ভেবেছেন। আর তাই তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যুদ্ধে নামতে যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত দেখছি যে, এতে আমাদের দেশ বাংলাদেশে এরা ফিরে আসার কোন ব্যবস্থাই এখন করতে পারবেন না। আমাদের অবশিষ্ট সারা জীবনটাই হয়তো এদেশে (ভারতে) শরণার্থীর জীবন-

যাপন করতে হবে। (বাংলাদেশের বুকে তখনই অর্থাৎ ঘোর বর্ষার নদীনালায় পানি ভরাট অবস্থার মধ্যেই অনতিবিলম্বে বাড়িয়া সেনাভিযান শুরু করবার জন্য তাজউদ্দিন প্রমুখ মুজিবনগর সরকারের দিল্লীতে আকুলভাবে দেন দরবার করে ফিরবার তখনকার খবরও আমাদের প্রায় সবারই জানা ছিল। আর ভারতের সামরিক হাই কমান্ডের বিষয়টিতে স্ট্রাটেজী যা-ছিল সেসব কথা পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ ও ইস্টার্ন কমান্ডের লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা প্রকাশ করেছেন। তখনকার পরবর্তী আসন্ন শুকনো শীতের মৌসুমে বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় সেনাভিযান পাঠাবার পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা- যা ইতিপূর্বে আমরা নানাভাবে লিখে প্রকাশ করেছি)।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জিত হবার পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসবার প্রথম সুযোগেই কলকাতা থেকে বনগাঁর স্থলপথে খুলনা হয়ে জলপথের রকেট স্টীমার সার্ভিসযোগে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। খুলনা-ঢাকা নদীপথের ইতিপূর্বের যুদ্ধকালীন পেতে রাখা মাইন পরিষ্কার করতে ওই পথের ২/৩ সপ্তাহকাল সময় লেগেছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকের এক সময়ে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে খুলনা-ঢাকা রকেট স্টীমার সার্ভিস পুনরায় চালু হয়েছিল। ফলে তখনকার জানুয়ারীর প্রথম ক'টা দিন আমাদের যশোর-খুলনা অঞ্চলেই অপেক্ষা করে দিন কাটাতে হয়েছিল।

খুলনা থেকে রকেট স্টীমার সার্ভিসযোগে ঢাকায় ফিরে আসবার পথে স্টীমারে সহযাত্রীরূপে একজন কেতাদুরস্ত স্যুট পরিহিত বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর কথায় জেনেছিলাম, তিনি সরকারি সিভিল এভিয়েশনের একজন পদস্থ টেকনিক্যাল অফিসার ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশোর্ধ ছিল বলে মনে হয়েছিল। (ঐ বিশেষ সময়কালে এক সময় আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধা মামা উইং কমান্ডার এস, আর, মির্জা বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক তথা ডিজি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।)

একাত্তরের ডিসেম্বরে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করবার শেষ মুহূর্তগুলোতে লুটপাট শুরু হয়েছিল। তখন যশোর বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি কে বা কারা খুলে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনসহ মস্কোপন্থী কমরেড মনি সিংদের অন্যায় আবদারমূলক কর্মকাণ্ডকে, আর ভারতের ইন্দিরা কংগ্রেসী সরকারকে অনেক সময়ই সে সব আবদারকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল বলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মহান দেশপ্রেমিক নেতা মওলানা ভাসানীকে পর্যন্ত ভারতে পেয়ে তাঁর গতিবিধি সেখানে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছিল। তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল, তা ভারতের বহুল প্রচারিত দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দিল্লীস্থ রেসিডেন্ট এডিটর বাবু নন্দন কাগঈলসহ অনেকে তখনই আমাদের বলেছিলেন, লিখেছিলেন।

বিদেশী শক্তির সহায়তায় নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়াও ছিল আওয়ামী বলয়ভুক্তদের তখনকার দিন থেকে 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার মহান ইতিহাসকে, জনগণের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে তাই আওয়ামী লীগ বিকৃতকরণের পথটি তখন থেকেই ধরে। সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে আমাদের ন্যায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে একটু একটু করে এখনকার দিনে বিরাটাকারেই প্রকাশ হতে হয়েছে। আরও প্রকাশ হচ্ছে। অপরদিকে বিদেশী অর্থ-সুইস ব্যাংকে শেখ মুজিবের গোপনে পাকদের একাউন্ট ত্রিশ কোটি ডলারের বিপুল অর্থব্যয়ের উত্তরাধিকার সূত্রের প্রাপ্ত ক্ষমতার দাপটে মুক্তিযুদ্ধের নামে লুটপাটের কালো কাহিনী আওয়ামী লীগ চাপা দিতে চাইছে। আমার এই বইটিতে ওদের ইতিহাসটি কৃতকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যক্ষেত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে।

—গোলাম মহিউদ্দিন।
মিরাজী, শিবকাঠী, বগুড়া

[১]

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একটি গৌরবোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সংগ্রামী দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের ন্যায় বহুসংখ্যক লেখক-সাংবাদিক, সংবাদপত্রসেবীও বাংলাদেশের উপরোক্ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টিতে কম-বেশি অংশগ্রহণ করেছি। ইতিহাসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও হয়তো হয়েছি।

তখনকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক আলোকচিত্র শিল্পীসহ বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিদের অনেককেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ করে একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিটি শুরুর আগের পরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার বিবরণ তখনকার প্রথম সুযোগের মুহূর্তেই নিজেদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকায় লিখে ও রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করবার ন্যায় অসংখ্য রেকর্ড রেখেছেন। আমাদের মতো নিজেদের স্বদেশবাসীদেরও অনেকে তখনই লিখে প্রকাশের প্রথম সুযোগ পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম। পত্র-পত্রিকায় লিখে ও রেডিও টেলিভিশনে পাকিস্তানী বর্বর হানাদারদের সেসব দিনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ এবং বাংলাদেশের প্রতিরোধকামীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলবার কথা প্রচার করেছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সেই ভরা কালটিতেই, সক্রিয় থেকে ওতে অংশ গ্রহণকালেই আমার সেই পরিণত বয়সকালের সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার লিখিত বিবরণ দিল্লীস্থ প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া তখনকার বিশ্বখ্যাত (লন্ডন টাইমসের) পির হ্যাজেনহার্স্ট, (ডেইলি টেলিগ্রামের) সাইমন ড্রিং, (ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল ইউ পি আই-এর) রবার্ট কেইলর, (নিউজ উইক-এর) টনি ক্লিফটন, (নিউ ইয়র্ক টাইমসের) সিডনী স্যান্ডবার্গসহ ডজনাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর লেখালেখির সঙ্গে মুদ্রিতাকারে তখনই দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। আমার সেই রচনা 'লাইফ উইথ দ্যা জেনারেলস' শিরোনামযুক্ত হয়ে প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার বেশ কিছু তথ্য আমাদের উপরোক্ত লেখালেখির ও রেডিও টেলিভিশনের রেকর্ডকৃত বিষয়বস্তু হতেও পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী লেলিহান আগুনের মধ্যে নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কলম সৈনিক-শব্দ সৈনিকরূপের এক অবস্থান হতে আমাদের তথ্যাদি সংগ্রহের রেকর্ডকৃত বিষয়সমূহের বর্ণনা অতিরঞ্জন কিছুটা রয়েছে কিনা– ভুলত্রুটির কিছু সেসবে উপস্থিত রয়েছে কিনা জানিনা। তবে মুক্তমনের ওসব লেখা থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় বহু উপাদান ইতিহাসের লেখকরা সংগ্রহে সক্ষম হবেন। যুদ্ধের আগুনে পোড়া খাঁটি সোনারূপে ইতিহাসের সেসব উপাদান গণ্য করলেও তা ভুল হবে না।

সীমান্তপারের আনন্দ বাজারী চরিত্রের বাবু শ্রেণীটিকে এক চরম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাস সৃষ্টিকে এক অবজ্ঞার সুরেই উল্লেখ করতে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক-কালের ভারতের কলকাতায় প্রকাশিত দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় 'বাংলাদেশের একাত্তরের একটি মুক্তিযুদ্ধের গপ্পো চালু রয়েছে' অবজ্ঞার সুরে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধও ছাপা হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে তাদেরও দেখা গেছে।

উপরোক্ত আনন্দ বাজার বলয়ের বাবু শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীর দলটির রয়েছে এক প্রচণ্ড পাকিস্তান বিদ্বেষের মনোভাব। পাকিস্তানের সূচনাকাল হতেই এক চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বাবু শ্রেণীটির পাকিস্তান বিদ্বেষ প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা গেছে। ভারতের কলকাতার মুক্তমনা মার্কসবাদী প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশ্বখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার (সম্প্রতি মৃত) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বাবু সমর সেন নিজেও তা কাছে থেকে লক্ষ্য করে তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত' শীর্ষক বইটিতে লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উক্ত বইটির একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ বাংলাদেশের সঙ্কটের (অর্থাৎ একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের) সময় আমাদের (বাবু শ্রেণীটির) জাতীয় সংহতি একটা অভূতপূর্ব রূপ নিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই তদ্গত উত্তেজিত, লেখার বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে দিল। নানা কারণে সেটা হয়তো

স্বাভাবিক ছিল। প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ, যে বিদ্বেষের নানা অঙ্গভঙ্গী, নানা যুক্তি।....তবে সঙ্কটের সময় বাস্তব নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু শেখ মুজিবের সর্বদা সপ্তগ্রামে-ওঠা কণ্ঠস্বর, তৎমুহূর্তের (বাংলাদেশ থেকে) পলাতকদের নানা বানোয়াট গল্প, রবীন্দ্র সঙ্গীত, সোনার বাংলা সব মিলিয়ে একটি অনবদ্য খিচুড়ি পাক হয়, যে খিচুড়িতে এমন কি অল্প বয়স্কদেরও পেট ফাঁপে, মাথা পাকা হয় না। (কলকাতা থেকে সমর সেন রচিত প্রকাশিত বই 'বাবু বৃত্তান্ত' পৃষ্ঠা- ৮৪)

নিজের অন্তরে চরম সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ পোষণ করে বিশ্বের কোন মহান সৃষ্টির সহায়ক হওয়া যায় না। কলকাতার আনন্দ বাজারী বুদ্ধিজীবীরূপী বাবু শ্রেণীটি আরেকবার নিজেরাই এর প্রমাণ সৃষ্টি করেছেন। একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উক্ত আনন্দ বাজারী বাবু শ্রেণীটি তাদের এই কালো প্রমাণটিরও সৃষ্টি তখন থেকে করে রেখেছেন। আর তাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের আজকের জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সঙ্কল্প-দৃঢ় মনোভাবকেও আজ একই বিদ্বেষভাব নিয়ে তারা দেখছেন এবং বাংলাদেশের একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে তিক্ত-বিদ্বেষের সুরেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে ওসব লেখালেখির ঃ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গপ্পো চালু রয়েছে' তারা আজ প্রচার শুরু করেছেন। দেখেছি আনন্দ বাজারীদের বিদ্বেষমূলক প্রচারক, আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসের মধ্যে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামস্থ সংশ্লিষ্ট কর্তাদেরও দেখেছি তাচ্ছিল্যের ভাব।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসকালের মধ্যে তাদের কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েই তাদের উপরোক্ত তীব্র বিদ্বেষের মনোভাবটিকে বুঝতে আমাদের বিলম্ব ঘটেনি। 'দাদা' 'দাদা' ডেকে বাবুভজা আমাদের স্বদেশবাসী (বাংলাদেশী বাঙালী) বুদ্ধিজীবীদের ক'জনকেও তখন তাদের সেই 'দাদা'দের উচ্ছিষ্টভোগীর ভূমিকায় আমরা নিবেদিত প্রাণ হয়েই থাকতে দেখেছি। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই জীবিকা। শরণার্থীদের জীবনযাপনের একটি পথ খোঁজা। ওদের ক'জনকে আজও 'নিমক হারামী' করতে দেখা যায় না। দাদাদের প্রতি এদের সেই কৃতজ্ঞতার বহরে এখনও ঘাটতি দেখা

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার বেশ কিছু তথ্য আমাদের উপরোক্ত লেখালেখির ও রেডিও টেলিভিশনের রেকর্ডকৃত বিষয়বস্তু হতেও পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী লেলিহান আগুনের মধ্যে নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কলম সৈনিক-শব্দ সৈনিকরূপের এক অবস্থান হতে আমাদের তথ্যাদি সংগ্রহের রেকর্ডকৃত বিষয়সমূহের বর্ণনা অতিরঞ্জন কিছুটা রয়েছে কিনা– ভুলত্রুটির কিছু সেসবে উপস্থিত রয়েছে কিনা জানিনা। তবে মুক্তমনের ওসব লেখা থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় বহু উপাদান ইতিহাসের লেখকরা সংগ্রহে সক্ষম হবেন। যুদ্ধের আগুনে পোড়া খাঁটি সোনারূপে ইতিহাসের সেসব উপাদান গণ্য করলেও তা ভুল হবে না।

সীমান্তপারের আনন্দ বাজারী চরিত্রের বাবু শ্রেণীটিকে এক চরম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাস সৃষ্টিকে এক অবজ্ঞার সুরেই উল্লেখ করতে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক-কালের ভারতের কলকাতায় প্রকাশিত দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় 'বাংলাদেশের একাত্তরের একটি মুক্তিযুদ্ধের গপ্পো চালু রয়েছে' অবজ্ঞার সুরে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধও ছাপা হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে তাদেরও দেখা গেছে।

উপরোক্ত আনন্দ বাজার বলয়ের বাবু শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীর দলটির রয়েছে এক প্রচণ্ড পাকিস্তান বিদ্বেষের মনোভাব। পাকিস্তানের সূচনাকাল হতেই এক চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বাবু শ্রেণীটির পাকিস্তান বিদ্বেষ প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা গেছে। ভারতের কলকাতার মুক্তমনা মার্কসবাদী প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশ্বখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার (সম্প্রতি মৃত) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বাবু সমর সেন নিজেও তা কাছে থেকে লক্ষ্য করে তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত' শীর্ষক বইটিতে লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উক্ত বইটির একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ বাংলাদেশের সঙ্কটের (অর্থাৎ একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের) সময় আমাদের (বাবু শ্রেণীটির) জাতীয় সংহতি একটা অভূতপূর্ব রূপ নিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই তদ্‌গত উত্তেজিত, লেখার বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে দিল। নানা কারণে সেটা হয়তো

স্বাভাবিক ছিল। প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ, যে বিদ্বেষের নানা অঙ্গভঙ্গী, নানা যুক্তি।....তবে সঙ্কটের সময় বাস্তব নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু শেখ মুজিবের সর্বদা সপ্তগ্রামে-ওঠা কণ্ঠস্বর, তৎমুহূর্তের (বাংলাদেশ থেকে) পলাতকদের নানা বানোয়াট গল্প, রবীন্দ্র সঙ্গীত, সোনার বাংলা সব মিলিয়ে একটি অনবদ্য খিচুড়ি পাক হয়, যে খিচুড়িতে এমন কি অল্প বয়স্কদেরও পেট ফাঁপে, মাথা পাকা হয় না। (কলকাতা থেকে সমর সেন রচিত প্রকাশিত বই 'বাবু বৃত্তান্ত' পৃষ্ঠা- ৮৪)

নিজের অন্তরে চরম সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ পোষণ করে বিশ্বের কোন মহান সৃষ্টির সহায়ক হওয়া যায় না। কলকাতার আনন্দ বাজারী বুদ্ধিজীবীরূপী বাবু শ্রেণীটি আরেকবার নিজেরাই এর প্রমাণ সৃষ্টি করেছেন। একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উক্ত আনন্দ বাজারী বাবু শ্রেণীটি তাদের এই কালো প্রমাণটিরও সৃষ্টি তখন থেকে করে রেখেছেন। আর তাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের আজকের জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সঙ্কল্প-দৃঢ় মনোভাবকেও আজ একই বিদ্বেষভাব নিয়ে তারা দেখছেন এবং বাংলাদেশের একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে তিক্ত-বিদ্বেষের সুরেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে ওসব লেখালেখির ঃ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গপ্পো চালু রয়েছে' তারা আজ প্রচার শুরু করেছেন। দেখেছি আনন্দ বাজারীদের বিদ্বেষমূলক প্রচারক, আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসের মধ্যে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামস্থ সংশ্লিষ্ট কর্তাদেরও দেখেছি তাচ্ছিল্যের ভাব।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসকালের মধ্যে তাদের কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েই তাদের উপরোক্ত তীব্র বিদ্বেষের মনোভাবটিকে বুঝতে আমাদের বিলম্ব ঘটেনি। 'দাদা' 'দাদা' ডেকে বাবুভজা আমাদের স্বদেশবাসী (বাংলাদেশী বাঙালী) বুদ্ধিজীবীদের ক'জনকেও তখন তাদের সেই 'দাদা'দের উচ্ছিষ্টভোগীর ভূমিকায় আমরা নিবেদিত প্রাণ হয়েই থাকতে দেখেছি। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই জীবিকা। শরণার্থীদের জীবনযাপনের একটি পথ খোঁজা। ওদের ক'জনকে আজও 'নিমক হারামী' করতে দেখা যায় না। দাদাদের প্রতি এদের সেই কৃতজ্ঞতার বহরে এখনও ঘাটতি দেখা

যায় না। বরং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে যতই জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ইস্পাত দৃঢ় কঠিন শপথে ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় এদেশে এরা দেখছেন ততই নিজেদের প্রতি দাদাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এদেশের গণমানুষের চেতনায় আঘাত করে করে আহত করতে দেশদ্রোহকার জাতিদ্রোহকার লেখালেখির মাত্রা এদেশেও এরা (এই দেশদ্রোহীরা) বৃদ্ধি করেছেন। সীমান্ত পারের পত্র-পত্রিকাতেও করছেন। চরম সাম্প্রদায়িক দাদাদের বাহবা (পুরস্কারের টাকাও) কুড়াচ্ছেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা মিথ্যে অর্ধসত্য লিখে নিজের দেশকে হেয় করতেই যেন তারা এসব করছেন। ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে থেকে সু শামসুর রাহমান-কে জি মোস্তফাদের পাকিস্তানভজা তৎপরতার কথাকে ভুলিয়ে দেবার প্রচেষ্টাতেই এরা এসব করছে তা স্পষ্ট।

এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী লেখক-সাংবাদিক-কবিদের আজকের বাংলাদেশের পটভূমিতে পালনকৃত ভূমিকা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আর তেমন কোন প্রয়োজন রয়েছে মনে করি না। নিজ নিজ সামর্থের চেয়ে স্বাচ্ছন্দের জীবন-জীবিকা অর্জনের জন্যেই, এখন প্রয়োজনে দেশদ্রোহিতার লেখালেখিতেও উপরোক্ত দাদাভজা শ্রেণীটির আজ প্রায় কাউকেই পিছিয়ে থাকতে দেখা যায় না। (আজকের দিনের লেখালেখিতে তসলিমা নাসরিন নামের একজনকে তো নিজ 'বাংলাদেশের মানচিত্রের সীমানা ঘষে মুছে ফেলে' দিল্লী শাসিত বৃহত দেশটির সম্প্রসারণবাদী খায়েশ পূরণের প্রকাশ্য এজেন্টরূপে একজন দেশদ্রোহীরূপে নিয়োজিত থাকতে দেখছি। আদি জীবনে আমাদের সবার সামনে পরের দ্রব্য চুরি করে ধরা পড়েও আজকের দিনে প্রবীণ বয়সকালের বেলাল চৌধুরী দাদাদের উষ্ণ দৃষ্টিপাতের 'উম' পেয়ে সেখানে থেকেই কবিরূপে ফুটে উঠেছেন। আরও অধিক উষ্ণতার 'উম' ওদের নিকট হতে অনেক কম বয়সেই পাবার ফলে তসলিমা নাসরিনের যশো-ভাগ্যকেও আজ প্রকাশ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। তবে অপ্রকাশ্যে অর্থ. সম্পদের কতটা লাভ তার হচ্ছে ওর হিসেব পুরোপুরিভাবে জানা সম্ভব না হলেও অনুমান করা যায়।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালেও একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে দেখেছি, নিজ নিজ জীবনকে বা দেহ এবং আত্মাকে একসঙ্গে ধরে রাখবার জন্য জীবিকার কতটা নিদারুণ প্রয়োজন। আমাদের ন্যায় কলমচালকদের

অনেকেরই বুদ্ধি রয়েছে, যে বুদ্ধি দিয়ে আমাদের কলম চালিয়ে জীবিকা অর্জন। আর একাত্তরে শরণার্থীর জীবনযাপন করতে বুদ্ধিকে কতটা মর্মান্তিক হীনতার সঙ্গে পণ্য বানিয়ে জীবিকায় পরিণত করা হয়েছিল, এরও প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি।

আজকের বাংলাদেশের একজন প্রথম সারির উপন্যাসিক লেখক অধ্যাপক শওকত ওসমান। সেই একাত্তর সালেই প্রায় বৃদ্ধত্বেই পা দিয়ে তিনি কলকাতায় শরণার্থীর জীবনকে বেছে নিতে তখন বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দিনগুলোতে ও-ছাড়া অনেকেরই আর অন্য কোন পথ ছিল না। সেই সময়কালটিতে অবশ্য কবি শামসুর রাহমান-এর ন্যায় তাদের বলয়ের বেশ কয়েকজন কলমচালক বুদ্ধিজীবীকে পাকিস্তানী হানাদার কবলিত ঢাকা শহরটিতে স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনের পূর্ব-পথটির যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। তখন কবি শামসুর রাহমানরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো ন'মাসের সময়কালটিতেই ঢাকায় টিক্কা-ইয়াহিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় বেতনভোগী সিনিয়ার সহকারী সম্পাদকের পদে থেকে হানাদার পাকিস্তানীদের সেবাদাস বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও অখণ্ড (সামরিক শাসিত) পাকিস্তানের সপক্ষে লেখালেখির তখনও বন্যা সৃষ্টিতে তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। ঢাকায় বসে নিয়মিত মাসিক তন্‌খা ও নিরাপত্তা ওতে লাভ করেছিলেন। (তখনকার দিনগুলোতে ঢাকায় গাড়ি হাঁকিয়ে চলে শহীদুল্লাহ কায়সারকেও কি কর্মসাধন করতে হচ্ছিল!)

পাকিস্তানী হানাদারমুক্ত ঢাকায় কবি শামসুর রাহমানরা এখন কলম ঘুরিয়ে লিখছেন– আর প্রমাণ রাখতে চাইছেন যে, তাদের মতো স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি ভূ-ভারতে নেই। বাংলাদেশে তো আজ যৎসামান্যই রয়েছে। পূর্বের অপরাধ ঢাকতে এখন শামসুর রাহমানরা কি-না করছে!

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালের কলকাতায় তথা ভারতের শরণার্থী জীবনে বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ঔপন্যাসিক-লেখক অধ্যাপক শওকত ওসমানকে সেখানে লেখালেখিতেও জীবিকা অর্জনের এক নিদারুণ প্রয়াস চালাতে হয়েছে। আজকের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীর পরিচয়ধারীদের শীর্ষস্থানীয় একজন তিনি। কিন্তু সেসব দিনের উন্নাসিক আনন্দ বাজারী

বলয়ের পত্র-পত্রিকায় ফরমায়েশী লেখালেখিতে তাঁর (অধ্যাপক শওকত ওসমানেরও) চরম অবমাননাকর অবস্থাটিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। একাত্তরের 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ফরমায়েশ প্রাপ্ত একজন বাংলাদেশী লেখকরূপে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর ওভাবে ফরমায়েশী উপন্যাসকে তেমন মানসম্মতরূপে রচনা করা তাঁর পক্ষে তখন হয়তো সম্ভব ছিল না। তখন অর্থ-উপার্জনের এক বিশেষ তাগিদেই তিনি হয়তো শারদীয় সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সেই ফরমায়েশী উপন্যাসটি লিখেছিলেন। সেই বিশেষ শারদীয় সংখ্যাটিতে তা প্রকাশিত হবার পরেই সেখানকার বাবু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিসহ অন্য পাঠকদেরও ব্যাপক প্রতিক্রিয়াকে সেখানে লক্ষ্য করেছিলাম। মানুষকে হেয় করবার যত প্রকারের ইতর ভাষা ঐ দেশীয় বাবু শ্রেণীটির নিজেদের জানা রয়েছে উক্ত বাংলাদেশী প্রধান লেখকসহ লেখাটিকে উদ্দেশ্য করে প্রয়োগ ও প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ সেদিন তাদের মধ্যে জাগেনি। সেই বিশেষ মুহূর্তে কলকাতার দেশ-আনন্দ বাজারের নিয়মিত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-প্রসু মিত্রদের সঙ্গে দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কামরায় লেখকদের আড্ডায় আমরা প্রবেশ করেই তাদের ব্যাঙ্গাত্মক হুলফোটানোর ভাষায় মন্তব্য শুনেছি ঃ 'এদের অর্থাৎ ঢাকা থেকে আগত এই (মুসলমান!) শরণার্থী লেখকদের আর কতদিনে এখান থেকে বিদায় করা যাবে!' কথাটা কলকাতার নানাস্থানে অনেকবার শুনেছি। তবে ওখানে আমার প্রকাশিত কোন লেখা সম্পর্কেই এসব কথা শুনিনি। বরং প্রশংসা সূচক মন্তব্যই কানে এসেছে। ওর পরেও সেখানকার জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে ফরমায়েশী 'দূর্গা পূজা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সার্বজনীন উৎসব' শীর্ষক আরেক লিখবার বিষয়টিকে আনন্দ বাজার পত্রিকায় উপ-সম্পাদকীয় কলামের রচনারূপে প্রকাশিত হবার পরে আমাদের সবার তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখনকার দিনের ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় আমাদের মুক্ত কলমের কিছু লেখালেখিও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বাবু শ্রেণীটির সেসব ছিল না। বস্তুনিষ্ঠ মানসম্মত আমাদের সেসব লেখালেখিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লেখার বেশ কিছু উপাদান আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে। আজও গর্বের সঙ্গে তা আমরা দাবি করতে পারি।

একাত্তরের মার্চের পাকিস্তানী হানাদারী বিশ্বাসঘাতকতায় তৎমুহূর্তের অপ্রস্তুত অবস্থায় একটি যুদ্ধকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখনকার সত্তরের পাকিস্তানের নির্বাচন জয়ী ও পাকিস্তান জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা শেখ মুজিবকে তার প্রত্যাশিত প্রধান মন্ত্রীত্বের গদি প্রদানের কাজটি বিলম্বিত করাও হয়েছিল।

এতে তখনকার স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় পিণ্ডি-ইসলামাবাদের সামরিক শাসনের কবল হতে দেশ জাতিকে মুক্তির চরম দাবিটিকেই উত্থাপন করতে দেখা যায়। ঢাকায় জনতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। সিংহকণ্ঠ মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিজ নিজ কণ্ঠের স্বাধীনতার বাণীকে সবার অন্তরে ধারণ করে এতদকালের স্বাধীনতার দাবিটিকে অতি দ্রুত এক সংগঠিত রূপ প্রদানের তখনকার চরম আশংকাটিকে লক্ষ্য করেই পাকিস্তানী ইয়াহিয়া শাসকরা একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সমর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেন। অপরদিকে নির্বাচনজয়ী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে মার্চের মাঝের দিনগুলো থেকে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে ঢাকা বৈঠকে অপ্রয়োজনীয় দর কষাকষিতে কালক্ষেপণের কৌশলটিও গ্রহণ করেন। তখন তাকে ভাওতাবাজীতে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

তখনকার (একাত্তরের) ২৫ মার্চের কালো রাত্রিটির পূর্বের অখণ্ড রাষ্ট্র পাকিস্তানের এই ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলে ইয়াহিয়া-টিক্কার সামরিক অভিযান প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়। আর তখনই পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে এখানকার নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেই ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পি. আই. এ. বিমানযোগে কলম্বোর আকাশপথে করাচি ফিরে যান।

ওর পরবর্তীকালের অনতিবিলম্বে, আর একটি দিনে ঢাকা থেকে পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা শেখ মুজিবকেও বিমানযোগে করাচিতে হেফাজতে নিয়ে যাবার সংবাদচিত্র দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তান সরকারই প্রকাশ করেছিলেন দেখেছি।

মুক্তিসংগ্রামী দেশবাসীর একটি সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের যথার্থ মনমানসিকতা শেখ মুজিবের মধ্যে কোন দিনই ছিল না। এর প্রধান প্রধান প্রত্যক্ষদর্শী দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, লেখক, ইতিহাস পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আমি নিজেও একজন। সেই একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিটির পূর্বের দীর্ঘদিন আমি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পিণ্ডি-ইসলামাবাদ রাজধানী অঞ্চলে সাংবাদিকতার সমাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করেছি। নিজ পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাংলাভাষী আত্মীয়-পরিবার-পরিজনের উপর তখনকার পাকিস্তানী সামরিক ক্রাক ডাউনের আসন্নতার আভাস পেয়েই সেখান থেকে হাজার হাজার মাইলের দূর্গম পথ এক চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে পাড়ি দিয়ে ঢাকায় ফিরেছিলাম। পাকিস্তানী আসন্ন সামরিক ক্রাক ডাউনের আশংকার কথাটি যথাসম্ভব পরিচিত সবার মধ্যেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। ওর পরেই প্রথম সুযোগ প্রাপ্তির মুহূর্তটি হতেই একাত্তরের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদি প্রত্যাশী নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিবকে ঢাকায় আইউব-ভূট্টোর চক্রটি এক প্রতারণামূলক সমঝোতার বাতাবরণে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। শেষ মুহূর্তে নেতা শেখ মুজিবের হয়তো হুঁশ ফিরে এসেছিল। তখন তাঁর নাকি আর করবার মতো কিছুই ছিল না। নিজেকে তখনই সুড় সুড় করে ওদের হেফাজতে তুলে দিয়েছিলেন। আসন্ন ভবিষ্যতেই তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করবার মুলোটি তাঁর সামনে তখনও ঝুলে ছিল। তখনকার (একাত্তরের) ২৫ মার্চের চরম মুহূর্তের সন্ধ্যাকালটিতে তাঁর ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনটিতে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক-আলোকচিত্র শিল্পীদের এক সাংবাদিক সম্মেলনের নামে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

উক্ত ২৫ মার্চের সন্ধ্যায় ধানমন্ডি শেখ মুজিব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনটি হবে সেই আশায় আমন্ত্রিত আমরা সবাই এক অধীর আগ্রহ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। সন্ধ্যা থেকে ওর পরবর্তী সন্ধ্যারাতের আমাদের এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়কাল শেষে, নেতা শেখ মুজিবের বদলে তাঁর প্রেস সেক্রেটারী আমিনুল হক বাদশা ভেতর থেকে আসেন এবং তখনকার 'আগামী ২৭ মার্চ' হরতাল আহ্বানের কথা বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি আমাদের সবার সামনে পড়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে বিদায় দেন। ফলে

নেতা শেখ মুজিবের তরফ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার কোন কথা আগে বা পরে আমাদের ন্যায় দেশ-বিদেশের অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক লেখকদের কারও জানা নেই। তা জানা থাকলে তো তখনকার আমাদের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রত্যক্ষদর্শনের লেখালেখির বিবরণে ওর উল্লেখ বিশেষভাবেই থাকতো। আমরা বরং এখন সবাই লিখেছি, শেখ মুজিব সেই ২৫ মার্চের দিবাগত সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী কোন সময়ই স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রদান করেন নি। স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আর তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান অঞ্চলের আশ্রয়ে যাবার পূর্বে ঢাকায় নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবারটিকে পাকিস্তানী হানাদার কর্তৃপক্ষের হেফাজতে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিবের সেই স্বেচ্ছা অনুপস্থিতিতেই আক্রান্ত জাতিটিকে এদেশের বুকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত করতে হয়েছিল। তা জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হবার যথাযথ পথ ধারণ করেছিল। শেখ মুজিবের তখনকার বিশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকার মতো বাস্তব অবস্থা তখন এদেশে আর ছিল না।

সেই চরম মুহূর্তে ভারতে (মুজিবনগরের) আশ্রয় গ্রহণকারী তাজউদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি সহায়তা প্রদানের নামে ইন্দিরা শাসিত ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনীর ঢাকা অভিযানের ন্যায় এক সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদারদের অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ ও কূটনৈতিক চাপের মুখে পাকিস্তান থেকে লন্ডন-দিল্লীর পথে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন তখনই সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর ছত্রছায়ায় মুজিব সরকার তখনকার মতো ঢাকার গদিতে বসেছিলেন।

ভারতীয় বাহিনীর সামরিক হস্তক্ষেপের ছত্র-ছায়ায় শেখ মুজিবের ঢাকায় ক্ষমতামিত্রতাকে এদেশের সত্যিকার মুক্তিকামী মানুষ খোলা মনে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের এসব সত্যি কাহিনী আজ যে ক্রমাগতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে তা লিখে মুদ্রিতাকারেও ধরে রাখা হচ্ছে। আমাদের প্রত্যক্ষদর্শনের ক্ষদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে তা ক্রমেই সম্পূর্ণরূপ ধারণ করছে।

[২]

একাত্তরের ২৫ মার্চের দিবাগত মধ্যরাতের এক সময়ে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির নির্জবাসভবন হতে পাকিস্তানী ফৌজী হানাদারদের একটি দল শেখ মুজিবকে তাঁর নিজের দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড়-চোপড়ের পোটলা-পোটলি সহকারে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তখনকার সেই মুহূর্তটিতে তাঁকে সেখানে শেষ সঙ্গ দিতে মুজিবের নিজ পরিবারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার একজনকেও সেই বাড়িটিতে দেখা যায়নি। ওর আগেই তাদের সবাইকে হয়তো আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, সেই সূচিত নাটকটির অনতিবিলম্বেই অবসান ঘটবে এবং ওরপরেই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর পরিবার-পরিজনরূপে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর উপরোক্ত পরিবার পরিজনের পুণর্মিলনে তেমন কোন বিলম্ব ঘটবে না। হানাদার পাকিস্তানী ফৌজী আক্রমণের প্রচণ্ডতায় 'ভেতো বাঙালী' তাদের স্বাধীনতার দাবির 'বাখোয়াজ' নিয়ে খুব বেশি দিন সময়কাল বিরোধিতার ময়দানে সচল থাকবে না। সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকে যাবে।

তাই সেদিন দিবাগত মধ্যরাতে শেখ মুজিবকে তুলে নিয়ে যাবার বেশ কয়েক ঘন্টা পূর্বেই, ঢাকাস্থ ইয়াহিয়া-টিক্কাখানের সামরিক প্রশাসন একইভাবে সহযোগিতা প্রদান করে ধানমন্ডির নিজেদের ৩২নং বাসভবনের অদূরবর্তী আরেকটি সরকারি ভাড়ার বাড়িতে শেখ মুজিবের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরিবারটির সামরিক নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের সে বাড়িটিতে মুক্তিযুদ্ধের আগাগোড়া ন'মাসাধিককাল শেখ মুজিব পরিবার নিজেদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। এমন কি নিজেদের দুগ্ধবতী গাভীটিকেও তাদের এই নতুন আবাসস্থলে নিয়ে যেতে দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তানী সংশ্লিষ্টদের পরবর্তী স্মৃতিচারণমূলক লেখালেখির অনেক কিছুতেই এসব দেখা গেছে। শেখ মুজিব পরিবারকে পাকিস্তানী

হানাদারদের নিরাপত্তামূলক প্রহরাধীনে রাখবার সেই বাড়িটির ব্যবস্থা টিক্কা-রাও ফরমান আলীরা ওর আগেই করে রেখেছিলেন। তাদের তখনকার নব্যবন্ধু শেখ মুজিবের পরিবারের সেখানে যেন কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁরা (টিক্কা-রাও-ফরমান আলীরা) সহৃদয় দৃষ্টি রেখেছিলেন।

শেখ মুজিবকে (তৎকালীন পশ্চিম) পাকিস্তানে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে নিজেদের বাসভবন থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত নিরাপত্তামূলক জীবনযাপনের ব্যবস্থা ইয়াহিয়া-টিক্কা-রাও ফরমান আলীর ন্যায় বাঙালীর প্রতি নৃশংসতা প্রদর্শনকারী পাকিস্তানী ফৌজীরা অকারণেই করবেন, এটা ভাবাই যায় না। এক নৃশংস পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তা (যিনি নিজেকে শেখ মুজিবের একজন জানী দোস্তরূপে নিজ লেখালেখিতে উপর্যুপরি দাবি করেছেন এবং শেখ মুজিব সেই দাবির বিরুদ্ধে একটিবারও প্রতিবাদ-আপত্তি তোলেন নি সেই) রাও ফরমান আলীকেও পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণে একাত্তরের ২৫ মার্চ সন্ধ্যা পরবর্তী সময়কালটির বর্ণনায় 'ইস্রাফিলের ধ্বংসের শিঙ্গা বেজে উঠলো' বলতে দ্বিধাবোধ করতে দেখা যায়নি। তখনকার মুহূর্তে, ২৫ মার্চের দিবাগত রাত থেকে আমরা ঢাকায় যারা নিজ নিজ আবাসস্থলে আটকে পড়েছিলাম, পাকিস্তানী ফৌজী হিংস্রতার এক রূপকে সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি। ওদের অগ্নিসংযোগে সমস্ত ঢাকা শহরটাই তখন যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত ঢাকা শহরটাই যেন জ্বলেপুড়ে তখনই ছাই হয়ে যাবে। কারফিউ কবলিত ঢাকায় আমরা ঘরে আটক থেকে তখন নিজেদের হাত-পা কামড়াচ্ছিলাম, নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায়। ঢাকা শহরের ফুটপাতবাসীসহ সেই কারফিউ কবলিত শহরে হানাদারী টহলরত পাক ফৌজীরা বাইরে যাদেরকেই পেয়েছিল তাদের নির্মমভাবে হাজারে হাজারে গুলি করে হত্যা করেছিল। দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে সেখানে রাতে শয়নরত প্রতিটি মানুষকেই এক হিংস্র উল্লাসে পাকিস্তানী হানাদাররা গুলি করে হত্যা করছিল। খুনের দরিয়া বইয়ে দিয়েছিল।

টাঙ্গাইল সন্তোষে শতাব্দীর বিশ্বের মহান নেতা মওলানা ভাসানীর পূর্ণকুটিরটিকে অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও ওদের বিবেকে বাধেনি। যশোরের তখনকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য এডভোকেট মশিউর

রহমানকে পলায়নের সুযোগ না দিয়ে ধরে ফেলবার পরেই নৃশংস অত্যাচার করে সেই প্রবীণ রাজনীতিককে হত্যা করতেও পাকিস্তানীরা দ্বিধাবোধ করেনি। এসবের সামন্যতম আঁচড়ও শেখ মুজিব বা তাঁর পরিবারটির গায়ে লাগেনি। অখণ্ড পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীত্বের আপোষ ফরমূলার বিষয়টিকে তখনকার আসন্ন ভবিষ্যতে-তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার 'হল্লাগোল্লা' সৃষ্টিকারী সাধারণ 'বেয়াদব' মানুষকে শায়েস্তা করে ঘরে তুলে দেবার পরবর্তীকালের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে নির্বাচনজয়ী বাঙালী নেতা শেখ মুজিব তখনকার মতো তাদের নিকট এক অপরিহার্য (বাঙালী) নেতৃত্বের প্রতীক হয়েছিলেন। তাই তাঁর ও পরিবারটির গায়ে উপরোক্ত নির্যাতনের আগুনের আঁচড়টুকু ওরা তখন লাগতে দেননি। নিরাপত্তামূলক হেফাজতের প্রহরায় তাদেরকে রেখেছিলেন। এক প্রকারের জামাই আদরেই তাদেরকে রাখা হয়েছিল, এর অজস্র প্রামাণ্য দলিল মওজুদ রয়েছে। পাকিস্তানের সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী (বর্তমানে মরহুম) জহিরউদ্দিন সাহেবও ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী।

সাম্প্রতিককালে শেখ মুজিব পরিবারের জেষ্ঠ জামাতা অণুবিজ্ঞানী ডকটর ওয়াজেদের একাত্তরের দিনগুলোর স্মৃতিচারণমূলক প্রকাশিত লেখার লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে (In between the lines) উপরোক্ত বহু সত্যই আজ ফুটে বের হয়েছে। এভাবেই মিথ্যার স্তুপ ভেদ করে সত্য ফুটে উঠেছে।

শেখ মুজিব ছিলেন সত্তরের পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী নেতা। তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের আরেক রাজনীতিক নির্বাচনজয়ী নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো পাঞ্জাবী গণতন্ত্রবিরোধী সামরিক চক্রকে সাথে নিয়ে চক্রান্ত করে তখনকার পাকিস্তানের কথিত 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' শেখ মুজিবের পিণ্ডি-ইসলামাবাদে গদিতে বসবার পথে অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বিষয়টিতে বিলম্ব ঘটাচ্ছিলেন। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গণতন্ত্রমনস্ক সচেতন জনগণকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। তখনকার সিংহকণ্ঠ মওলানা ভাসানীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলার জনগণ মাঠে ময়দানে স্বাধীনতার দাবিতেও সোচ্চার হয়ে নেমে পড়েছিলেন।

তখনকার সেই স্বাধীনতার দাবিতে শেখ মুজিবের সময় ছিল না। পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' শেখ মুজিবের ন্যায় ক্ষমতার গদিলোভী রাজনীতিকের ওতে আন্তরিকভাবে সময় দেয়া সম্ভব ছিল না। একাত্তরের মধ্য মার্চ হতে ঢাকা বৈঠকে দর কষাকষির আলোচনার এক পর্যায়ে চক্রান্তকারী পাকিস্তানী ফৌজী কর্তৃপক্ষের এক বিপর্যয়কারী ভুল চাপে আর্মি ক্রাক ডাউনের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হয়েছিল। আর সেই ক্রাক ডাউনের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করবার মুহূর্তে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ পাবার স্বপ্নে বিভোর বাঙালী শেখ মুজিব যে ঐ পক্ষের লোক হয়েছিলেন তার প্রমাণ জুলফিকার আলী ভূট্টোর 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডী' ও বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসির টাইম পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শনের বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়। সুতরাং সেই একাত্তরের ২৫ মার্চের শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কথাটির মধ্যে সত্যের লেশ মাত্রও নেই। তিনি তখন গ্রেফতার হননি। ঢাকায় ইয়াহিয়া-টিক্কা-রাও ফরমান আলীর পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতায় নিজ পরিবারটির ঢাকায় এক নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ের ব্যবস্থা তিনি (শেখ মুজিব) করেছিলেন এবং তার পরেই ঐ একই পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হাওয়াই জাহাজে জেনারেল ইয়াহিয়ার পিছে পিছে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার ন্যায় ক্রাক ডাউনের বিষয়টিতে তাঁরও সম্মতি যে আদায় করা হয়নি তা নয়। আর্মি ক্রাক ডাউনের বিষয়টিতে এক প্রকারের সম্মতি তাঁর থেকেও আদায় করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পদটি তিনি (শেখ মুজিব) জেনারেল ইয়াহিয়াকে দিতে চেয়েছিলেন। আর সেই জেনারেল ইয়াহিয়া তাদের সেই গদী ভাগাভাগির জোটবদ্ধতার শর্তপূরণ করতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদটির জন্য শেখ মুজিবের ন্যায্য দাবিটিকে সমর্থন করেছিলেন। অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুটি রাষ্ট্রে বিভক্তির কারণে তখন ভেঙ্গে পড়লে তো পরে ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব কারও পক্ষেই ক্ষমতা ভাগাভাগির শর্তপূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ইয়াহিয়ার মতো শেখ মুজিবও তখন পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক– দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ুক তা চাননি। একমাত্র পি. পি. পি. নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোই পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডরূপে দেখতে চেয়েছিলেন এর প্রমাণ রয়েছে।

একাত্তরের ২৫ মার্চের সেই চরম মধ্যরাতের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনটির আশা পরিত্যাগ করেননি। তাই তখনও তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতায় একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আর তখনকার সেই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তাই স্বেচ্ছায় তাদের (পাকিস্তানীদের) হেফাজতে ওদের দেশে অবস্থান গ্রহণের বিষয়টিকেই তখনকার মতো বেছে নিয়েছিলেন। (তখনকার দিল্লীস্থ ভারতের ইন্দিরা কংগ্রেসী সরকারও নাকি শেখ মুজিবকে তাঁদের ভারতে আশ্রয় প্রদানের জন্য নিয়ে যাবার যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছিলেন, ভারতীয় অশোক রায়না তাঁর 'ইন সাইড র (Raw) শীর্ষক' বইটিতে লিখেছেন। ভারতে প্রকাশিত অশোক রায়নার বইটিতে তিনি লিখেছিলেন, চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সৈন্য যখন মাঠে নেমে পড়ে তখন 'র'-অপারেটরদের দিল্লী থেকে পাওয়া বার্তানুযায়ী আদেশ পালনে পাগল পাড়া অবস্থা হয়। তারা দীর্ঘ বারো ঘন্টা ধরে শেখ মুজিবকে, তাদের পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে ঢাকা ত্যাগ করার অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু মুজিব জেদের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ না-করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি আগামীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ লাভকেই তখনও প্রাধান্য দেন।)

আবার 'দুই নৌকায় পা রাখবার' কূটকৌশলে শেখ মুজিব নাকি শেষ মুহূর্তে ভারতীয় গোয়েন্দা 'র'-অপারেটরদের সঙ্গে তাঁর তাজউদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের সীমান্ত পারে ভারতেও যাবার অনুমতি দেন। সংশ্লিষ্ট বইপত্রে এসব কথা লিখে প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা 'র'-অপারেটররাই তাদের গাইড করে সীমান্ত পারে নিয়েছিল। রায়না লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে লুটপাটে অংশগ্রহণকারী এম, আর, আখতার মুকুলরাও পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনজয়ী দলনেতা শেখ মুজিব একাত্তরের ২৫ মার্চের ঐতিহাসিক কালো রাত্রিটির সূচনাকালে নিজে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী হানাদার ফৌজীদের সঙ্গে ইতিপূর্বের নিজ সহযোগিতার প্রসারিত হস্তকে আরও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করতেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তাদের সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক শিরোমনিকে গ্রেফতারের তখন কোন প্রশ্নই ওঠে নি। তিনি (শেখ মুজিব) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। সেই একাত্তরের মধ্য মার্চের দিনগুলোর

আলোচনায় সত্য-মিথ্যা আশ্বাস শেষ পর্যন্তও তাকে দেয়া হয়েছিল যে, তখনকার আগ্নেয়গিরিসম অগ্নি উদ্গীরক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যতটুকু প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করে স্বাভাবিক করা যাবে। তা করেই জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে এবং তিনি নিশ্চিতভাবে (শেখ মুজিব) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

এরকম একটি আশ্বাসের মূলো ইয়াহিয়া-ভূট্টোর চক্রটি তখন শেখ মুজিবের সম্মুখে ঝুলিয়ে দিয়েই তাঁকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। বাংলাদেশের তখনকার মুহূর্তের স্বাধীনতা যুদ্ধের তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না, বরং তখনকার পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানসহ যেকোন অংশেরই 'বিচ্ছিন্ন' হবার বিষয়টির 'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বিরোধিতা করবেন, এটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই তখনকার মুহূর্তটিতে শেখ মুজিবের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পরে বানোয়াট দাবিটিকে তোলা হয়েছে। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাটি তখনকার কোন সময়েই দেননি। পরিষ্কার দিনের মতো এই বাস্তব সত্যকে নিয়ে আজ বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই।

তিনি (শেখ মুজিব) বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধবিরোধী এক বৃহত্তর পাকিস্তানী চক্রান্তের অঙ্গরূপে নিজের ভূমিকাকে স্বেচ্ছায় জড়িত করে রাখবার উদ্দেশ্যে সেই মুহূর্তটিতে তাদের (পাকিস্তানী হানাদারদের) পক্ষে চলে গিয়েছিলেন। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে সত্যের লক্ষ্যপথে যাত্রার ফলে একটির পর আরেকটি করে অজস্র রেকর্ড আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শেখ মুজিবের একাত্তরের আগস্ট/সেপ্টেম্বরের প্রদত্ত জবানবন্দীটি তো পাকিস্তান সরকারের দলিলপত্রে মওজুদ রয়েছে।

তখনকার (একাত্তরের ২৫ মার্চের ক্রাক ডাউনের আগের-পরের) মুহূর্তের আমাদের অন্যান্য সবার প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ২৬ মার্চের বেতার ভাষণ, পাকিস্তানের সিন্ধী নির্বাচনজয়ী রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভূট্টোর 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডী' শিরোনামযুক্ত বইটির ভাষ্যের সঙ্গে বিশ্বখ্যাত পাশ্চাত্যের মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসির প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রকাশিত রিপোর্টটিকে মিলিয়ে দেখলে, পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে, বাঙালী নেতা শেখ মুজিবকে তখন এক

মিথ্যা গদীর লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানীরা প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছিলেন। ২৫ মার্চের কালো রাত্রিটি হতে পরবর্তী বাংলাদেশের বুকে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার চরমরূপটিকে তিনি তখন হয়তো নিজের কল্পনাতেও নিয়ে আসতে পারেননি। তাই সেই অপকর্মটিতে তাঁর সম্মতি আদায়ের সহযোগিতাটুকু ইয়াহিয়া-ভূট্টো-টিক্কারা তখন পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ন'মাসের যুদ্ধের রাজনীতিতে পরে জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সামরিক চক্রটি এক নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানিতে মুহ্যমান হয়েছিলেন। আর সেই মুহূর্তে সুযোগ সন্ধানী উপরোক্ত সিন্ধী রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরাজিত জেনারেলদের হাত থেকে পাকিস্তানের খণ্ডিত অংশটুকুর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। তখনকার জন্য সাময়িকভাবে হলেও, পাকিস্তানের পাঞ্জাবী প্রধান সামরিক জেনারেল চক্রটি দেশীয় রাজনীতিক ভুট্টোর নিকটেও পরাজয় মেনে নিতে তেমন দ্বিরুক্তি করেননি।

তখনকার দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সাংবাদিকদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা সংবাদ রিপোর্টের বিষয়বস্তুতে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগ্রহণের এক সফল নাটকীয়তারও বিবরণ রয়েছে দেখা যায়। তৎমুহূর্তে (পাকিস্তানীদের ঢাকায় চরম সামরিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাকিস্তানী বিশেষ প্রতিনিধি দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নাটকীয়ভাবে কাগজপত্রের ফাইল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে শূন্যে উড়িয়ে দিতে দিতে ক্ষোভভরে জাতিসংঘ ভবন থেকে বেরিয়ে চলে আসবার দৃশ্যটিকে চলচ্চিত্রায়িতরূপে টেলিভিশনের বিশ্ববাসী প্রচারে দেখে আমরা সবাই চমৎকৃত হয়েছিলাম। বাংলাদেশে পরাজয় ও ঢাকায় প্রায় লক্ষ পাকিস্তানী ফৌজীর আত্মসমর্পণের ক্রোধে-ক্ষোভে করাচিসহ পাকিস্তানের মানুষ তখন এক ভাঙ্গাচুরের বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। জেনারেল ইয়াহিয়াসহ পাঞ্জাবী প্রধান জেনারেলচক্রটি বিক্ষোভের প্রধান টার্গেট ছিল। সেই মুহূর্তটিতে এক সুনিপুণ রাজনৈতিক নটরূপে জুলফিকার ভুট্টোর সেই নাট্যাভিনয় পাকিস্তানী (MOB) মব-এর হৃদয় জয় করেছিল। নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন থেকে বের হয়ে বিমানযোগে

তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সরকারি ভবনে সরাসরি উপস্থিত হলেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর ফ্লাগবিহীন গাড়িটি নিয়ে সেদিন পিণ্ডিতে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভবনে প্রবেশ করলেন। আর কিছু সময় ধরে সেখান থেকে তাঁর ফিরতি যাত্রার সেই গাড়িটিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পতাকা উড়িয়ে বের হয়ে এলেন। তখনকার দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এই দৃশ্যটির নাটকীয়তারও এক চমৎকার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

বিগত সত্তরের পাকিস্তানের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ আসন বিজয়ী পি. পি. পি. নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতার দর কষাকষির এক আবেগজড়িত মুহূর্তে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানী নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ 'তুম উধার– আওর হাম ইধার।' অর্থাৎ তুমি (শেখ মুজিব) ওদিকে ক্ষমতায় থাকতে পারো– আর এদিকে (পশ্চিম পাকিস্তানে) আমি ক্ষমতায় বসবো।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সেই উচ্চারিত কথাই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আর শেখ মুজিবকেও পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবার সেই নির্মম বাস্তবতাকে মেনে নিতে হলো। সত্তরের অখণ্ড পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের স্বপ্ন তখন থেকে স্বপ্নেই পরিণত হয়ে রইলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সোনার হরিণটি তাঁকে আর ধরা দেয়নি। যে জন্য তিনি একাত্তরের মধ্য মার্চের পরবর্তী দিনগুলো হতে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানী সামরিক জেনারেল চক্রটির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি শুধু নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরিবারটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই, তাঁর নিজের বাংলাভাষী জাতিটিকে পাকিস্তানী বর্বর হানাদারদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণের মুখে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। নিজের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাঝে আরেক কালো অধ্যায়েরই সৃষ্টি করেছিলেন। সেই কুহকিনী আশার পাকিস্তানের পিণ্ডি-ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীটিতে তাঁর আর বসা হলো না। তখনকার

মতো ভুট্টোর চালে ইয়াহিয়া-মুজিব দু'জনই মাৎ হলেন। ঐ পরাজয়কে ইয়াহিয়া বা মুজিবের কেউই খুশি মনে মেনে নেননি।

একাত্তরের ২৬ মার্চে পাকিস্তানী মাথা মোটা সামরিক জেনারেল চক্রটির প্রস্তুতকৃত বেতার ভাষণে তখনকার সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পুতুলের মতো শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলতে হয়েছিল যে, এই লোকটি (শেখ মুজিব) 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'। ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা ঠিক নয়। একাত্তরের শেখ মুজিব 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছিলেন না।

সেই ইয়াহিয়াকেই পরবর্তীতে রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করবার পরে ক্ষমতাচ্যুত ইয়াহিয়া নিজ বিশ্বাস বলে একেবারে উল্টো কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর শেষ জীবনকালে তিনি একমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোকেই দায়ী করে বলেন যে, 'ওর চক্রান্তেই একাত্তরের পাকিস্তানের সেই দ্বিখণ্ডিত হবার ন্যায় বিপর্যয়টি ঘটেছে। ক্ষমতার লোভে এই লোকটি (ভুট্টো) দেশটিকে (অখণ্ড পাকিস্তানকে) ভেঙ্গেছেন।' ওতে পাকিস্তানের এক চরম চরিত্রহীন মদমাতাল ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রনায়কের আপশোস প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শেখ মুজিবকেও ঢাকার গদীতে প্রায় একই প্রকারের ভুট্টোবিরোধী ক্ষোভকে অন্তরে চেপে রেখে বসে থাকতে হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধান রাজনীতিক ও পাকিস্তান তেহরিক-এ-ইস্তেকলাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান তাঁর তখনকার স্মৃতিচারণমূলক 'জেনারেলস ইন পলিটিকস' শীর্ষক বইটিতেও বিষটির উপর আলোকপাত করেছেন। তা থেকেও ইয়াহিয়ার অনুরূপ ভুট্টোর ঐতিহাসিক অপরাধের কথা বের হয়ে এসেছে। ইতিহাসের সত্যটি আজ প্রায় পুরোপুরিভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আজকের) পাকিস্তান রাষ্ট্রটির ক্ষমতার গদীর লোভে একাত্তরের সেই ধ্বংসাত্মক চালটি চেলেছিলেন। অপরদিকে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের তখনকার এ ন্যায়সঙ্গত দাবীদার শেখ মুজিব পাকিস্তানকে অবিভক্তই রাখতে চেয়েছিলেন। আর তাই বাংলাদেশের একাত্তরের ২৫ মার্চের চরম মুহূর্তটিতেও শেখ মুজিব জাতির প্রত্যাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাটি দেননি।

বিশ্বাসঘাতকতামূলক পাকিস্তানী হানাদারদের হামলার মুখে বাংলাদেশ তখন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, প্রতিরোধকে সংগঠিত করতে, শেখ মুজিবের অপারগতাকে ধরে রেখে আর নিষ্ক্রীয় থাকেনি। জাতীয় তাগিদে তখনকার একজন অজ্ঞাত পরিচয় বিদ্রোহী মেজর জিয়াকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাটি তখনই ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে দেবার ন্যায় এক উজ্জ্বলতম ইতিহাসের সৃষ্টি করতে হয়েছে। এরপরে প্রতিরোধ যুদ্ধকে সংগঠিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দৃপ্তপদে স্বাধীনতার লক্ষ্য পথ ধরে এগিয়েছে। এতে বিদ্রোহে প্রতিরোধে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এভাবেই পলাশীর দুশো চৌদ্দ বছর পরে আমরা আবার স্বাধীন হয়েছি।

তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আশাটিকে এভাবেও আমরা, যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকারভাবে অংশগ্রহণ করে ধূলিসাৎ করেছি, পরবর্তীতে কোনদিনই তাদের কেউই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন শেখ মুজিবের ক্ষমা লাভ করিনি। অনেকটা আমাদের উদ্দেশ্যেই প্রথম থেকে হুংকার ছেড়েছিলেন ঃ 'নকশালী দেখিলেই গুলি করিবে।' আজকের শেখ হাসিনার আওয়ামী বলয়ভুক্তদের কথিত 'ঘাতক-দালাল' শ্রেণীটিকে তো তেমন করে সেদিনে ক্ষমতাসীন শেখ মুজিবের শত্রুর আসনে বসাবার রাজনৈতিক প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। তাই তাদের বিরুদ্ধে চরম আদেশ না দিয়ে তিনি (শেখ মুজিব) আমাদের ন্যায় মুক্তিযোদ্ধাদেরই 'নকশালী' বলে হত্যা করবার চরম আদেশটি দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের সেই আদেশের ফলে আমাদের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা মুজিব সরকারের হাতে নিহত হয়েছিল।

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরূপে প্রত্যক্ষ দর্শনের জানা-শোনার এসব বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যতটা সম্ভব সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরবার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস এখানে রয়েছে। বাংলাদেশের ও জাতির মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের এসব ইতিহাসের কথা সততার সঙ্গে তুলে ধরবার কতটা দায়িত্ব পালন করেছি, পাঠক-পাঠকরাই তার যথার্থ বিচার করবেন।

[৩]

ইতিহাস রচনার কিছু কিছু উপাদানকে স্মৃতিচারণ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও এসব থেকে সংগ্রহ করে ইতিহাস লেখা সম্ভব, যদি সেসব স্মৃতিচারণ সততার সঙ্গে করা হয়েছে প্রমাণ করা যায়। কারণ অধিকাংশ স্মৃতিচারণ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্মৃতিচারণের অধিকাংশকেই বই-পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার কালে ধান্দাবাজ বিশেষ শ্রেণীটিকে ওসবের মধ্যে সততার লেশমাত্রকেও অবশিষ্ট রাখতে দেখা যায় না। আজকের দিনকালের বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় বই-পুস্তকের বাজারে এমন সব অসত্য ভেজাল বাজারী মালের সরবরাহের যেন ভরপুর অবস্থাটিরই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের ন'মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকালের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে তাঁর মৃত্যু-পূর্বের এক সময়ে এসব বাজারী মুক্তিযুদ্ধের বইপত্রের বিষয়টিতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি এক পরিহাসের মৃদু হাসিকে শ্বেতশুভ্র গোঁফের তলায় রেখে বলেন যে, '(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে) এসব রূপকথার কাহিনী'।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ক্রাক ডাউনের আঁচ পেয়েই তৎমুহূর্তে ঢাকা থেকে উধাও হয়ে ওর পরেই কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী তথা ভারতের কেন্দ্রীয় দিল্লীর সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার মাসোহারাভোগী লেখকদের ন্যায় আজ যারা দেশে (ঢাকায়) মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের কিছু না দেখেই বানোয়াট 'আমি বিজয় দেখেছি' ধরনের রূপকথার কাহিনী এবং বিদেশে (বিলেতে) বসে স্মৃতিচারণমূলক লেখালেখির নামে বৃহত্তর প্রতিবেশীর ভাড়াখাটা এজেন্টের (দেশদ্রোহীর) কাজ অব্যাহতভাবে আজও করে যাচ্ছেন, তাদের এসব প্রকাশিত-অপ্রকাশিত স্মৃতিচারণে (প্রায় কোন কিছু না দেখেই তথাকথিত স্মৃতিচারণে) সততার লেশমাত্র থাকা সম্ভব নয়, সবাই তা জানেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে' স্মৃতিচারণের নামে আজও এরা বাজারজাত করে চলেছেন

তাদের এসব বানোয়াটমূলক মালপত্র। কর্তার উদ্দেশ্য হাসিলেও এতে তারা সহায়ক হচ্ছেন। এতে এদের ভাল এনাম মিলছে, সন্দেহ নেই। (ভারতীয় অশোক রায়নার ন্যায় লেখক-সাংবাদিকের লেখা 'ইন সাইড র' জাতীয় বই-পত্রের লেখালেখিতেও বাংলাদেশের উপরোক্ত ভারতীয় গোয়েন্দা চর শ্রেণীটির বহুজনের পরিচয়কে ফাঁস করা হয়েছে। আজকের আওয়ামী বলয়ভুক্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী– আসলে উক্ত গোয়েন্দা সংস্থা হতে প্রাপ্ত অর্থজীবী অনেকের তথ্যই প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা-বিশেষ করে র (Raw)-এর সঙ্গে অনেক আগে থেকে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের কথাও উপরোক্ত বইটিতে রয়েছে।)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাঝে আমার লেখা 'লাইফ উইথ দ্য জেনারেলস' শীর্ষক পাকিস্তানী পাঞ্জাবী প্রধান সামরিক জেনারেলদের মাথা মোটা রাজনীতি চর্চার বিপর্যয়কর ফলাফলের বিবরণ দিল্লীস্থ প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া তখনই– একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের পূর্বেই তাদের প্রকাশনায় মুদ্রিত করে ও তখনই দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

উপরোল্লিখিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালটি হতে এর বহু পূর্বের রাজনীতিক শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার দিনগুলোর এক প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেও। বিগত ১৯৪৮– ৫২-এর ঐতিহাসিক মহান (বাংলা) ভাষা আন্দোলনের তরুণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-জীবনকাল হতেই কাছে থেকে তখনকার উদীয়মান শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকালটি দেখবার এক অমূল্য সুযোগ আমার হয়েছে। (ইতিপূর্বের তিরিশের ও চল্লিশের জার্মানীর উদীয়মান রাজনীতিক এডলফ হিটলারের অনেকটা সামরিক কায়দায় বুকে-কাধে দুটো করে প্যাচ পকেট ও সোলডার স্ট্রাপযুক্ত বুশশার্ট প্যান্ট-পরিহিত এবং একটি ব্যাটন বগলে বাংলার গোঁফদাড়ি মুজিবের ১৯৪৮– ৪৯-এর সময়কালের মফস্বল অঞ্চলে সফররত চেহারা-সুরতটি আজও আমার চোখে ভাসছে। সেই ছাত্র রাজনীতি থেকে পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে তিনি তার আদর্শ ফ্যাসীবাদী পুরুষ সিংহ যে-হিটলারের নিকৃষ্ট অনুকরণ করে এসেছেন তাঁর শিকার আমাদের অনেকেই হয়েছেন। মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম সেক্রেটারী টাঙ্গাইলের শামসুল হক তো আমাদের পরিচিত ভুবনের রাজনীতি হতে নির্মমভাবে

তখনই অপসৃত হয়েছেন। মুজিবের ফ্যাসীবাদী ক্ষমতালোভী রাজনীতি নিজের জীবনকালের বিভিন্ন সময়ে এসবের অনেক ঘটনাই ঘটিয়েছে। তিরিশের দশকের সূচনার বছরগুলো হতে জার্মানীতে নির্বাচনজয়ী হিটলার তার ফ্যাসীবাদী রাজনীতি চর্চায় বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানে এক শ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানীর কোটি কোটি মানুষকে নিধন হবার পথে তখনকার দিনে ঠেলে দিয়েছে। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে সমগ্র জার্মানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

সত্তরের বাংলার নির্বাচনজয়ী হয়ে শেখ মুজিব সেই সত্তর দশকের সূচনার দিনগুলোতেই তাঁর ক্ষমতালোভী রাজনীতি চর্চা করে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে নিধনের পথে এগিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। সোনার বাংলাদেশও এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শেখ মুজিবের কীর্তিকলাপের যথার্থ চিত্র যথার্থরূপেই তুলে ধরতে হবে। আর এই ইতিহাসকেই তবে এক অবিকৃত ইতিহাসরূপে বিশ্বের মহান ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যাবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাচারিতায় পরিপূর্ণ করে 'সত্যিকার' ইতিহাস লিখবার এক প্রয়াসে আজ মুজিববাদীরা ফাঁকা শোরগোল তুলেছেন। জার্মানীর হিটলারের পক্ষে জার্মানীর 'প্রতিভাবান' বুদ্ধিজীবী গ্যোয়েবলস যেমন শোরগোল তুলে সত্যকে মিথ্যার জঞ্জালে চাপা দিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজকের বাংলাদেশ আওয়ামী বলয়ের মুজিববাদী দলটি ফ্যুয়েরার' মার্কা ডেমি-গড 'জাতির পিতা', 'বঙ্গবন্ধু', 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী' ইত্যাদি গ্যাস বেলুনের আকারের শেখ মুজিবের ফাঁকা ভাবমূর্তিকে আমাদের দেশের শূন্যের আকাশে তুলে ধরতে চাইছেন। এদের এই ফোঁকোবাদী ভাবমূর্তিটিকে এদেশের ভুক্তভোগী মানুষের মাঝে এরা প্রতিষ্ঠিত করতেও ব্যর্থ হচ্ছেন। এসব ফোঁকোবাদীর দৃঢ়কঠিন আদর্শের বালাই নেই বলেই নানা বিভ্রান্তির পথ ধরে– আবার বার বার এদের তথাকথিত নীতিপথ পালটিয়েও এরা জনমনের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যপথে আর একবিন্দুও অগ্রসর হতে পারছেন না।)

ভাষা আন্দোলনের চরম ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর সময়কালটিতেও নানা জেলজুলুমসহ দৈহিক নির্যাতনভোগী আমি নিজেও তরুণ ছাত্ররূপে বগুড়া জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সম্মানজনক আহ্বায়কের গুরু দায়িত্বটি পালন করেছিলাম। তখন আমার রাজনীতিক আইনজীবী পিতা (বর্তমান মৃত) মোহাঃ আলিমউদ্দিন প্রবীণতর মওলানা

ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর (আমার পিতা মোহাঃ আলিমউদ্দিনের) তরুণ কলেজ ছাত্রজীবনেও তিনি মওলানা মোহাম্মদ আলী-শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাত্রজীবনকে ছেড়ে নিজ জেলা বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে তা সংগঠিতকরণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মওলানা ভাসানী নিজেও তখন হতে খেলাফত আন্দোলনে একজন সক্রিয় নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

আমার রাজনীতিক আইনজীবী পিতা মোহাঃ আলিমউদ্দিন তখন বগুড়ায় শুধু আওয়ামী লীগ কমিটি গঠনেই সক্রিয় ছিলেন না। বিগত পঞ্চাশের দশকের প্রাক্কাল হতে বগুড়ায় মুসলমান জমিদারী প্রতাপের এই শহরটিতে– যেখানে বগুড়ার নবাববাড়ি বা সাতানী বাড়ি নামক প্রবল প্রতাপসম্পন্ন মুসলমান জমিদার পরিবার মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন সেখানে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগের অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরবাড়ি ভাড়াতে পাওয়াও প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই সময়কালটিতেই পঞ্চাশের দশকের সূচনাকাল হতেই বগুড়া জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের অফিসগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বাদুড়তলা মহল্লাস্থ পৈত্রিক নিবাসের বহির্বাটীর প্রধান সড়ক সংলগ্ন প্রায় সব কয়েকটি কামরাই বিনা ভাড়ায় আমার পিতা আওয়ামী লীগের কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমার আইনজীবী পিতার চেম্বারের আসবাবপত্রও বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ অফিসের ব্যবহারের জন্য দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমাদের পিতৃগৃহে অবস্থিত সেই অফিস ঘরেই কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, এডভোকেট মশিউর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তরুণ-যুবক শেখ মুজিবকে সাংগঠনিক সফরে আসতে দেখেছি। ঐ অফিস ঘরটিতেই বৈঠক-মিটিং করতে দেখেছি। এমন কি প্রয়োজনে তখনকার সাংগঠনিক কাজে সফররত অবস্থায় শেখ মুজিবকে আমাদের গরীবখানায় দুটো ডালভাত খেয়ে বগুড়ায় ঐ অফিস ঘরটিতে দু'এক রাত্রিযাপন করে যেতেও দেখেছি।

বায়ান্নোর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকালে সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে আমাদের আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হয়েছে। আর এর অনেক আগের দিনগুলো হতেই

তখনকার তরুণ-যুবক আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবকে অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে কারান্তরালে অবস্থান করতে হয়েছিল।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ভরা মৌসুমটিতে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের মুসলিম লীগ জুলুমশাহী আমাদের যখন নির্বিচারে ধরপাকড় করে জেলে পুরছিলেন তখনই এক অজ্ঞাত কারণে ফরিদপুর জেলের বন্দী শেখ মুজিবকে মুক্তি প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা ভাসানীসহ তখন সবাই আমরা রাজবন্দীর জীবনযাপন করছিলাম।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে কারাবরণ করবার পরবর্তীতে আমাদের একে একে মুক্তি প্রদানের মাঝে একদিন বগুড়া জেল থেকে আমি মুক্তি লাভ করেছিলাম। বগুড়ায় নিজ পিতৃগৃহে সাময়িক আশ্রয় লাভ করেছিলাম। আমাদের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তদের অনেকের উপরই তৎমুহূর্তে চলাফেরার সরকারি নিয়ন্ত্রণ-ইনটার্নমেন্ট আদেশ ছিল। তখনই বগুড়া শহর ছেড়ে আমার অন্য কোথায়ও যাওয়ার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল।

এর পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিবকেও ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী তখনও রাজবন্দীরূপে কারান্তরালে। কারামুক্ত শেখ মুজিব তখন কারাবাসী মওলানা ভাসানীর নিকট হতে নাকি অনুমোদন (মৌখিক অনুমোদন) অর্জন করে আওয়ামী লীগের কর্ণধার হয়ে (সেক্রেটারীর পদে) বসেছেন। তখনকার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (টাঙ্গাইলবাসী) শামসুল হক নাকি তার মস্তিস্ক বিকৃতির তথাকথিত রোগটির কারণে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন না। তাই তখন শেখ মুজিবকেই নাকি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি তখন ঢাকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিস থেকে আমাদের ন্যায় সদ্য কারামুক্ত ভাষা সৈনিকদের সেভাবেই পরিচয় দিয়ে চিঠিপত্র লিখতেন। আমাদের বগুড়াস্থ পিতৃগৃহের ঠিকানাতেও আমি নিজেও সে-রকমের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম।

শেখ মুজিবের সেই কর্মতৎপর দিনগুলোতেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক নাকি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিখোঁজ হন। জনাব শামসুল হকের স্ত্রী অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন এর পর হতে দেশে বিদেশে তাঁর স্বামীর

(শামসুল হকের) অন্তর্ধানের পিছনে শেখ মুজিবেরও কালো হাত রয়েছে বলে সারা জীবনকাল ধরে অভিযোগ করেছেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কাজে আমরা যখন দেশে-বিদেশে সক্রিয় ছিলাম তখন ভারতের নয়া দিল্লীস্থ গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হোস্টেলে আমাদের অস্থায়ী আবাসস্থলে মার্কিন মুল্লুকের বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভারতীয় বাঙালী হিন্দু অধ্যাপক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারের কাজে সস্ত্রীক এসে আমাদের সঙ্গে ক'দিন ছিলেন। ভয়েস অব আমেরিকাখ্যাত বাঙালী সাংবাদিক-ব্রডকাস্টার প্রসুন মিত্রও আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। সর্বপ্রথমের 'জয়বাংলা' (নওগাঁ) পত্রিকার প্রকাশক (আসলে ব্যাংকার) রহমতুল্লাহও তাঁর কয়েক সপ্তাহের দিল্লীবাসকালে সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

উপরোক্ত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যাপক বাবু প্রায়ই নিখোঁজ শামসুল হকের স্ত্রী অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুনের কথা আমাদের সামনে তুলতেন। উক্ত মিসেস আফিয়া খাতুনও তখনকার দিনে মার্কিন মুল্লুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনার কাজে ছিলেন। সেখানেও তিনি তাঁর স্বামী শামসুল হকের অন্তর্ধানের পেছনে শেখ মুজিবের কালো হাত থাকবার কথা উপরোক্তদের সবার নিকটেই বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলে বেড়াতেন, হার্ভার্ড অধ্যাপকের মুখে আমরা সবাই তা শুনতাম। এতে সেসব দেশে তাদের মুজিবকে হিরো বানাবার প্রয়াস নাকি বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, অধ্যাপক বাবু দুঃখ করে বলতেন।

শেখ মুজিবের আগাগোড়া ফ্যাসীবাদী নৃশংস চরিত্রের রাজনীতি চর্চ্চার কথা আমাদেরও জানা রয়েছে। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী তাঁর প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনটিকে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি আমাদের সবার শ্রদ্ধা-সহযোগিতামূলক মনোভাব তখন হতেই ছিল। নির্যাতিত ভাষা সৈনিকরূপে তখন উক্ত বিষয়ক চিঠিপত্রকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণেও আমাদের তখন কোন মানসিক বাধা ছিল না।

তবে সে সময়কালটিতে দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক ধারায় (প্রথম দিকে এর কিছুটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশ হলেও) আমাদের ন্যায় ভাষা সৈনিকেরা অনেকেই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখনকার আন্ডার গ্রাউন্ডের

অধিবাসীরূপে তথাকথিত কমিউনিস্টরাই আমাদের ভাষা আন্দোলনের কাজকর্মের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছিল বলে এক ভুল ধারণা রয়েছে, তা ঠিক না। ঐ লোক কয়েকটি এর সুযোগ গ্রহণ করতে তখন সচেষ্ট-সক্রিয়ও ছিলেন দেখেছি। পরবর্তীতেও এরা অনেক কিছুর দাবি করছেন।

অপরদিকে তৎকালীন দিশেহারা গণবিরোধী মুসলিম লীগ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন ফাইলেও আমাদের নাকি 'কমিউনিস্ট'রূপে চিহ্নিতকরণ তখনই শুরু হয়েছিল। তখনকার জেলে দীর্ঘাকৃতির কাগজসমূহে আমাদের বিরুদ্ধে মুদ্রিত ডিটেনশন অর্ডার পড়েও তা মনে হয়েছিল। কমিউনিস্টরূপে তখনকার দিনেও পরিচিত দিনাজপুর শহরের বালুবাড়ীর মির্জা নুরুল হুদা (ছোটা), কাদের বক্‌শ অথবা বগুড়া ফুলবাড়ীর মোকলেছরা তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তখন আমাদের ন্যায় নব্য তরুণ রাজনীতিকদের কেউই 'মুসলিম' সংযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানটিতে সদস্যপদ লাভে তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করিনি। আমাদের ছাত্রজীবনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সিনিয়র ছাত্র মোহাম্মদ সুলতানের (সুলতান ভাইয়ের) নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামক ছাত্র সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের কাজে আমরা আত্মনিয়োজিত হয়ে পড়েছিলাম। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জীবনকালটিতেও সরকারি জেলজুলুম নির্যাতনভোগের আমাদের দিনকাল যেন অব্যাহতই ছিল। এতে একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালেও আরেক বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণাকে ভারতের সাময়িক প্রবাস জীবনে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। সেখানে একাত্তরে ভারতের আশ্রয়দাতা ইন্দিরা সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করে শেখ মুজিবের ছাত্র লীগের পরিচয় বহনকারীরা যে জামাই আদর লাভে সমর্থ হয়েছিলেন– আর জেনারেল ওভানের মুজিব বাহিনীর লোভনীয় রিক্রুট হতেও পেরেছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ করে মস্কোপন্থী দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠনটির ছেলেরা একেবারেই তা লাভে সক্ষম হননি। সেখানকার এ বিষয়ক প্রকট বৈষম্যের দৃশ্যগুলো বড়ই এদের সবার মর্মবেদনার কারণ হয়েছিল, দেখেছি।

'ওরা প্রথম শ্রেণীর– আমরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর বা ফ্যালনা শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা' ইত্যাদি ক্ষোভের কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি। তখন এদের সারা ভারতের পক্ষের হয়ে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ মহড়ায় অংশ নিয়েছিলেন

তাদের এক অংশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে অন্যদের বিক্ষুব্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শেষার্ধে আসন্ন শীত মৌসুমের প্রাক্কালে ভারত সরকার নাকি তাজউদ্দিন প্রমুখ মুজিবনগর সরকারসহ শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের দু'প্রস্ত করে গরম পশমী স্যুট উপহার দিয়েছিলেন। আর মনি সিং, মোজাফফরদের মাত্র এক প্রস্ত করে দিয়েছিলেন। এই বৈষম্যমূলক আচরণে তাদের সোচ্চার ক্ষোভ প্রকাশ দেখে অনেকেই তখন কৌতুকবোধ করেছে। আমি নিজে আমার ইতিপূর্বের সাংবাদিকতার কর্মস্থল পিণ্ডি-ইসলামাবাদ থেকে একাত্তরের প্রথমদিকে শীত মৌসুম শেষে আগের ব্যবহারের নিজের শীত বস্ত্রসহ সর্বস্ব সেখানে ছেড়ে পালিয়ে চলে এসেছিলাম। দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাইতে একাত্তর শেষের শীতের মৌসুমের শুরুতেই কাজকর্মে সফরে যৎসামান্য বস্ত্র নিয়ে যাতায়াতকালে দুয়েকটা গরম সোয়েটার-পুলওভার কম্বল আমার গায়ে সহৃদয়ভাবে স্থানীয়রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ডিসেম্বর পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত ঢাকা-বাংলাদেশে সেই দানপ্রাপ্ত সোয়েটার পুলওভার দুটো শীতকাতর রিকশাওয়ালাদের রিকশায় চড়বারকালে তাদের দিয়েছি। ভারতীয় কম্বলটি ভারতীয় বন্ধুদের সহৃদয়তার স্মৃতিচিহ্নরূপে আজ পর্যন্ত নিজের হেফাজতে সংরক্ষিত রেখেছি।

সুলতান ভাইয়ের নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা সৈনিকের মর্যাদা অর্জনকারী আমাদেরও সমবেত প্রয়াসে অনতিবিলম্বে এটি একটি বিস্তৃততর শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কারণে শেখ মুজিবকে তখন আমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতেও দেখেছিলাম। পরবর্তীতে তিনি নিজেও আমাদের দেখা পেলেই 'কমরেড' বলে পরিহাসের সুরে কথাবার্তা বলতেন। তবে ইতিপূর্বের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে তার সঙ্গে আমাদের অব্যাহত কথাবার্তার সম্পর্কে তখনও বাহ্যও তেমন চির ধরেনি দেখেছি। ইতিপূর্বের ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কটিকে আমরা আমাদের পক্ষ হতে আগাগোড়াই বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। এতে আমাদের তেমন কোন ত্রুটি ছিল না বলেই আগাগোড়াই আমার মনে হয়েছে। তবুও

একাত্তরের ডিসেম্বর পরবর্তী ঢাকায় তাকে যখন পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসে ক্ষমতার গদীতে বসিয়ে দেয়া হলো তখনকার অবস্থায় এক বিশেষ পরিবর্তন তার মধ্যে লক্ষ্য করতে ভুল করিনি। সত্তরের নির্বাচন প্রধানমন্ত্রীর গদীর তার ন্যায্য দাবিটিকে যেনতেন আকুল হয়েই পড়েছিলেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টো জেনারেল চক্রের সঙ্গে চাল-পাল্টা চালের ক্ষমতার গদী লাভের খেলার এক পর্যায়ে নিজের মাতৃভাষী দেশবাসী বাঙালীদের হানাদার পাকিস্তানী তোপের মুখে ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানের আশ্রয়ে চলে গেলেন। এক ঐতিহাসিক অপরাধ তখনই করলেন।

তীব্র পাকিস্তান বিদ্বেষের ফলে প্রতিবেশী দেশের রাজধানী দিল্লীর ইন্দিরা কংগ্রেসী সরকার যে শতাব্দীর সুযোগটি গ্রহণে সামান্যতমও বিলম্ব করতে চাইলেন না তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় কম্ব্যাট প্রধান সেনাপতি জেনারেল (যুদ্ধজয়ের পরবর্তীতে ফিল্ডমার্শাল) মানেকশসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তৃতা ভাষণ থেকেও প্রায় সবারই জানা হয়ে গেছে। ভারতের বিশ্বখ্যাত প্রবীণ লেখক-সাংবাদিক ও ইংরেজী সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মিঃ সমর সেন তাঁর কলকাতা ভারতে বাংলাভাষার প্রকাশিত 'বাবু বৃত্তান্ত' বইটিতে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল (ফিল্ডমার্শাল) মানেকশ-এর স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে লিখেছেন, একাত্তরের তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ-দমন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর ইন্দিরা সরকার ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেকশকে তখনই ঢাকায় সেনাভিযান পাঠিয়ে দখল করে নিতে বলেছিলেন। ভারতের সেনা প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী পিতা পণ্ডিত নেহরুর মতো আদেশ প্রদান ও তা পালনে বাধ্য করবার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তখন আর ছিল না। (বিগত ১৯৬২ সালের ভারতের চীন যুদ্ধে সিদ্ধান্ত-আদেশ নির্দেশ সেনাবাহিনীকে পালনে বাধ্য করার ফলেই নাকি হিমালয় যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। ভারতের চীন যুদ্ধে পরাজিত-বন্দী সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জন দালভি মুক্তিলাভের পরে তাঁর স্মৃতিচারণমুলক 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' Himalayan Blunder শীর্ষক ঢাউস সাইজের বইটিতে বিশদভাবে লিখে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বখ্যাত লন্ডন টাইমসের তখনকার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা অধ্যাপক

নেভিল ম্যাক্সওয়েল তাঁর 'ইন্ডিয়ান চায়না ওয়ার' শীর্ষক বইটিতেও তা লিখেছেন।

একাত্তরে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানেকশ তখনই ইন্দিরা মন্ত্রী সভার অসময়োচিত পূর্ব পাকিস্তান অভিযানের বিরুদ্ধে সামরিক কৌশলগত অসুবিধার যুক্তিতর্ক তুলে কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। ভারতীয় প্রধান সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের প্রকাশিত বক্তব্য মতে, যে ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসে একটিও চূড়ান্ত যুদ্ধজয়ের রেকর্ড নেই সেই ভারতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার আমলে পাকিস্তানের মাথা গরম জেনারেলদের ট্রাপে-ফাঁদে ফেলে একাত্তরের বাংলাদেশে ডিসেম্বরের বারো দিনের যুদ্ধে প্রায় পাকিস্তানী লক্ষ সৈন্যের আত্মসমর্পণ সহকারে পাকিস্তানকে চরম পরাজয় বরণে বাধ্য করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

আর সেই সাথে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীটির জন্য শেখ মুজিবকে এতো-কিছু করবার নিজ মাতৃভাষী দেশটির বাঙালী অধিবাসীদের খুনী পাকিস্তানী হানাদারদের কামানের গুলির মুখে ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানীদের পক্ষে চলে যাবার পর ঢাকায় পাকিস্তানী হানাদারদের পরাজয় বরণের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের শেষ চালটিও ভেস্তে গেল। তিনি পাকিস্তানের আর প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না। নিজ দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিসর্জন ও মা-বোনদের ইজ্জত হরণের মর্মান্তিক ঘটনার গ্লানিকে নিজ অন্তরে চেপেই ঢাকায় তাঁদের ফিরতি যাত্রাতেও ড. কামাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে আবার আসতে হয়েছিল। স্বজাতি বিরোধী এসব কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে তাঁকে তো ড. কামাল হোসেনই (সম্ভাবতঃ পাকিস্তানী অবাঙালী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজসেই) তখনকার দিনের বুদ্ধি যোগাতেন। তাই স্বাধীন বাংলা বেতারের, বিশেষ করে এম. আর. আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' শীর্ষক কথিকার বেতার প্রচারে চরম অপকর্মের হোতা ড. কামাল হোসেনের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছিল। আর ওরকম নির্বোধের মতো গুরু তথ্যটিকে বেতার প্রচারের 'চরমপত্র' শীর্ষক নিজ কথিকাটিতে ফাঁস করবার জন্য কথিকা লেখক-পাঠক এম. আর. আখতার মুকুল যে পরবর্তীতে তাদের 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবের ধমক খেয়েছিলেন তা তো তাদের আরেক

প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর এক প্রকাশিত লেখায় ফাঁস করেছেন। 'মুকুল, তুই আর কোনদিনই ফুটলি না-রে!'

একাত্তর পরবর্তী ঢাকায় শেখ মুজিব গদীতে বসে থাকলেও তাঁর একাত্তরের মার্চের এক সময়কাল হতে পরবর্তী সময়কালে পাকিস্তানীদের পক্ষে চলে যাবার গ্লানি সবসময়েই তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো, দেখেছি। আমাদের ন্যায় কোন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে তিনি তখন যেন আর সহ্য করতেই পারতেন না। ফলে তিনি ক্রমেই আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে যেন আড়ালে চলে যেতেই সচেষ্ট হলেন। এসব আরও পরের কাহিনী। এ থেকে আমাদের দুর্ভোগ শুরুর ও তা চরম আকার ধারণ করবার এক সময়ে আমাদের পরিবারের আজমীর শরীফের একজন পরিচিত প্রবীণ খাদেম ও শেখ মুজিব পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত পীর সাহেব (সৈয়দ গোলাম দস্তগীর ও তৎপুত্র কিবরিয়া) ১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে আজমীর শরীফে দিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনের একজন শীর্ষ স্থানীয় কূটনীতিককে আমাদের উপস্থিতিতেই বলেছিলেন ঃ ইন লোগকা সাথ শেখ মুজিবকা বহুত দোস্তী থা– আভি টুট গিয়া,' শেখ মুজিবের সঙ্গে আগে এঁদের ভাল সম্পর্ক ছিল– তা এখন ভেঙ্গে গেছে। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে শাসকরূপে এসে গদীতে বসবার পরেই শেখ মুজিবের সেই নির্মম 'নকশালী দেখিলেই গুলি করিবে' আদেশের শিকার তো আমরা সবাই হচ্ছিলাম। সুদুর আজমীর শরীফ থেকে ঢাকা সফরে যাতায়াতকারী প্রদান খাদেমদের নিকটেও তা তখন অজানা ছিল না। আজমীর শরীফে খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তীর মাজার এলাকায় বা দিল্লীর নিজামুদ্দিন -এ তখনকার রাজনৈতিক বিপন্নদের অনেককেই আশ্রয় দিয়ে তাঁরা (খাদেম বাবারা) জীবন রক্ষার মানবিক কাজগুলো করছেন তা দিল্লী-কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের অনেকেই জানতেন। যতটা সম্ভব তারাও এতে সহযোগিতা করতেন। হিটলারের জার্মানী থেকে যেমন করে নিজ নিজ প্রাণকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অনেককেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বিদেশের দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছে শেখ মুজিবের বাংলাদেশ থেকেও তখন তা করতে হয়েছে।)

আগের পঞ্চাশের সেই দিনগুলোর পরবর্তীতে আমার রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখির এক সময়কালের ষাটের দশকের মাঝের, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলাটির প্রাক্কালের এক সময়ে পাকিস্তানের বৃহত্তম বন্দর নগরী করাচিতে শেখ মুজিবের আরেকবার দেখা সাক্ষাত লাভ করেছিলাম। তখন তিনি সামরিক আইউব খানের শাসনের প্রাথমিক দিনগুলোর কারাবাস থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করেছিলেন। দুর্নীতির দায়ে সামরিক আইউব শাসনের সরকার অন্য আরও কয়েকজন রাজনীতিকের ন্যায় তাকেও গ্রেফতার করে পরে মুক্তিপ্রদান করেছিল। এর পরে তাঁর অবাঙালী নেতা সোহরাওয়ার্দীরও বিদেশের হোটেল বাসকালে মৃত্যু ঘটে।

তার আগের দশক শেষার্ধের ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের সময় হতে তিনি আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানীকে ছেড়ে করাচিবাসী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে এক 'শক্ত পেশী' আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এতে ঐ বিশেষ সময়কালটিতেও ঢাকা রূপমহল সিনেমা হলে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে আগত বয়োবৃদ্ধ পাঠান নেতা খান আবদুল গফফার খান, সিন্ধী জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল মজিদ সিন্ধী, পাঞ্জাবী প্রগতিশীল নেতা মিয়া ইফতিখারউদ্দিন, লাহোরের মাহমুল আলী কাসুরী, বালুচী নেতা গাউস বক্‌শ বেজেঞ্জো, মেঙ্গল, মারী, কোয়েটাবাসী আবদুস সামাদ আচকজায়ীসহ বাংলার মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, তরুণ-যুবক এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ প্রমুখের উপর লাঠিসোটা লোহার ডাণ্ডাসহ মারাত্মক হামলা চালিয়ে বৃদ্ধ বয়সী জাতীয় নেতাদের অনেককেই জখম করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তা তখনকার বিশ্বখ্যাত ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকাসহ দেশ-বিদেশের আরও বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তখনকার ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি (বিদেশী ভদ্রলোক) শেখ মুজিবকে স্বয়ং, সেই হামলা পরিচালনা করতে দেখে বিস্মিত হন এবং তাঁর মুখের উপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন লিখেছেন।

শেখ মুজিব তাঁর আদি জীবনকাল হতে কোনদিনই তাঁর রাজনীতি চর্চায় বিরুদ্ধ পক্ষের উপর ডাণ্ডাবাজির ধারাটিকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁর ১৯৭২–৭৫-এর বাংলাদেশ শাসনামলে ধারাটিকে চরম ফ্যাসীবাদী রূপ ধারণ করতে

আমরা দেখেছি। কন্যা শেখ হাসিনার আমলেও তাদের রাজনীতি চর্চার সেই ধারাটিকে আজ আবার প্রচণ্ডরূপ দেবার প্রয়াস চলছে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে 'শক্ত পেশী' রাজনৈতিক ধারাটির অবলম্বন করে পরবর্তীতে ক্ষমতায় যাবার রাজনীতিতে শেখ মুজিবের পারঙ্গমতাকে বিগত ১৯৫৪ সালের হক-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন জয়-পরবর্তী বছর কয়েকটিতেই অতি নিকট হতে লক্ষ্য করবার সুযোগ তখনও আমাদের হয়েছে। তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত তরুণ সৈনিকেরা আমরা দলে দলে সারা দেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। হক-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রার্থীদের পক্ষে ভোট ভিক্ষা করতে, তখনকার একটানা ৩/৪ মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ ছেড়ে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। যুক্তফ্রন্টের বিপুল নির্বাচনী বিজয়ের সাথে সাথে বিজয়ীর বেশে আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ঢাকা শহরে ফিরে এসেছিলাম।

তার অনতিবিলম্বে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে শেখ মুজিব কোটারীটির কয়েকজনের মন্ত্রীত্বের পদ-ক্ষমতা লোভের সব কিছু মিলিয়ে যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক বিজয়কে নস্যাতের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার শাহেদ আলী হত্যাসহ নানা ছুতাকে তুলে ধরে পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী সামরিক জেনারেল আইউব খান তাঁর সামরিক আইনের শাসন জারী করেছিলেন। প্রধান সাংবাদিক-রাজনীতির মরহুম আব্দুল মনসুর আহমদ তার 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক বইটিতে এর বিশদ বিবরণ লিখেছেন।

আইউবের সামরিক শাসনের বাধা-নির্যাতন এবং ওর পরেই নেতা সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে শেখ মুজিবকে তখনকার মুহূর্তে এক রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে দেখা গিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী করাচির পুঁজিপতি ইউসুফ হারুনদের আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেও তিনি তখন দ্বিধাবোধ করেননি।

শেখ মুজিবের ষাটের দশকের ও-রকম একটি রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মুহূর্তে পাকিস্তানের আমাদের অনেকের পরিচিত বাঙালী সি. এস. পি আহমেদ ফজলুর রহমানরা বিদেশী আগড়তলা ষড়যন্ত্রের যোগসাজশের পথটি

ধরে কথিত 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার' গঠন ও সেই সরকারের ক্ষমতার শীর্ষাসনে বসবার টোপটি তাকে দিয়েছিলেন এবং তখনই তিনি (শেখ মুজিব) তা লুফে নিয়েছিলেন।

তখনকার ঐ বিভ্রান্তি-হতাশার মুহূর্তে শেখ মুজিব আর অন্য কোন পথের আশা না করেই বিদেশী চক্রান্তের আগড়তলা ষড়যন্ত্রের যেন সহজ সরল পথটিকেই ধরে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রধান হতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তান ও ভারত থেকে তার পর হতে বিষয়টিতে বহু তথ্য প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীতে (বাংলাদেশ আমলে) শেখ মুজিবসহ আগড়তলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই এ-বিষয়ক স্বীকারোক্তি নিজেরাও প্রকাশ করেছেন। উপরোল্লিখিত ভারতীয় লেখক অশোক রায়না তাঁর 'ইন্‌সাইড র' শীর্ষক বইটিতেও লিখেছেন, বিগত ষাটের দশকের তখনকার দিনগুলো থেকে জনৈক শংকর নায়ার (ছদ্মনাম তাঁর কর্নেল মেনন) নামের জনৈক গোয়েন্দা কর্তাব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। (আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার নথীপত্রে কর্নেল মেনন-এর নামের বার বার উল্লেখ রয়েছে।) শেখ মুজিবের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সে-সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিল। ১৯৭১ পরবর্তী শেখ মুজিব শাসনামলে ভারতীয় গোয়েন্দা ('র') কর্মকর্তা মিঃ শংকর নায়ার ঢাকায় এসে সরকারি অতিথিরূপে রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের আতিথ্য উপভোগ করে গেছেন। অথচ ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিরোধী দলীয় প্রবীণ রাজনীতিক বাবু জয় প্রকাশ নারায়নকে মৃত্যুর পূর্বে একবার ঢাকায় সফরে নিয়ে আসবার প্রয়াসে শেখ মুজিব সরকার ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভারতের লোকনায়করূপে পরিচিত বৃদ্ধ সর্বোদয়নেতা জয় প্রকাশ নারায়ন একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বে জনমত গড়ে তুলতে সারা বিশ্ব সফর করেছিলেন। তখনকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সরাসরি অস্ত্র-রসদ সরবরাহের ব্যবস্থাদির জন্যই তিনি তা করেছিলেন। তখনকার ভারতের ইন্দিরা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি অস্ত্র পাবার সেই ব্যবস্থাটি তাকে করতে হয়েছিল। এতে ইন্দিরা সরকারের অসন্তোষ অপ্রকাশ্য ছিল না।

বিগত ১৯৬৮– ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও অগ্নিবর্ষী বক্তা মওলানা ভাসানীর তখনকার কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী জালেমদের জুলুমের বিরুদ্ধে 'জ্বালাও-পোড়াও' আন্দোলনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলাটির সমস্ত নথীপত্র গণরোষে জ্বলেপুড়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। সেই বিচার ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি রহমান তার গাত্রে একমাত্র পরিহিত স্লিপিং স্যুটটি ছাড়া সব কিছুই আগুনে পুড়ে-হারিয়ে বিমানযোগে লাহোরে পলায়ন করেছিলেন। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলাটির এতে এক প্রহসনমূলক পরিণতি ঘটে– মামলাটির এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবসহ অন্যান্যরা এতে সবাই খালাস পেয়েছিলেন।

তখনকার মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের সঠিক সময়কালের সঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ার চেতনাই সেদিন রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে ফাঁসি কাষ্ঠে শেখ মুজিবের ঝুলবার আশংকাটি থেকে তাঁর মুক্তিকে সম্ভব করেছিল। এর পরেও নিজের তখনকার জনপ্রিয়তার সেই তুঙ্গে ওঠার অবস্থাটিকে লক্ষ্য করে শেখ মুজিব শতাব্দীর মহান নেতা মওলানা ভাসানী ও জনগণকে তার ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় অপেক্ষা করে চলবারই পথ ধরেছিলেন। এ জন্য ইতিহাস তাঁকে কোনদিনই ক্ষমা করেনি। অনতিবিলম্বে ইতিহাসের শাস্তি তিনি ভোগ করেছেন। ইতিহাসের ক্ষমাহীনতার সেই বিয়োগান্তক পরিণতি যুগ যুগ ধরে ইতিহাসভুক্ত হয়ে রইবে।

[৪]

শেখ মুজিব ঢাকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসিন হলেন। তখন দেখা গেল, তিনি যেন একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। তাঁর সেই সাময়িক ক্ষমতাসিনতার আমলে উচ্ছিষ্টভোগীরও একটি শ্রেণীকে তাঁর ক্ষমতার আসনের চারপার্শ্বে নতুন করেই যেন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। মওলানা ভাসানীর ভাষায় ঐ উচ্ছিষ্টভোগীর শ্রেণীটিতে পত্রিকার 'কদমবুসী' সম্পাদকের ক'জনকেও অন্তর্ভুক্ত দেখা গিয়েছিল।

আজকের আওয়ামী বলয়ের রাজনীতিকদের সঙ্গে উপরোক্ত উচ্ছিষ্টভোগী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিকে তখন থেকেই যেন অব্যাহত সাহচর্য রক্ষা করে চলতে দেখা যায়। বিগত ১৯৭২– ৭৫-এর শাসনামলে রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব কত কোটি কোটি ডলার যে সুইস ব্যাংকের গোপন একাউন্টে পাচার করে রেখেছেন এর হিসেব নেই। আজ বিদেশী সেবাদাস শ্রেণীর এসব বাংলাদেশী লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী এ-থেকেও উচ্ছিষ্টভোগের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। আর এরাই এদের আজকের বক্তৃতা ভাষণে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক বানোয়াট করতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'-এর এক বানোয়াট মহত্বের বানোয়াট ইতিহাসকে তুলে ধরতে চাইছেন। আর সেজন্য এক পুরোপুরি বানোয়াট কাহিনীর সৃষ্টি করে লিখতেও এদের দেখা যায় যে, পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে একাত্তরের ২৫ মার্চের দিবাগত রাতের মাঝে পাকিস্তানী হানাদাররা গ্রেফতার করেছিল এবং গ্রেফতার হবার পূর্বে এক অস্তিত্বহীন বেতারযন্ত্র ট্রান্সমিটারযোগে (কোথায় থেকে সেই বেতারে ঘোষণা প্রচারের সেই ট্রান্সমিটারটি তখন শেখ মুজিবের বাসভবনে তার নিকট পৌছেছিল যে, সেই ভৌতিক ট্রান্সমিটারটির সহায়তায়) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রদান করেছিলেন। এসবের পুরোটাই মিথ্যাচার।

এসব মিথ্যাচারীর দলটি যে সময়কাল তাদের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণার নির্দেশ বা পরামর্শ প্রেরণের কথা বলছেন তখন তা একেবারেই অসম্ভব ছিল। কারণ তখনকার বিভিন্ন সূত্র হতে যেসব সত্য তথ্য এযাবৎকাল দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে এতে তিনি (শেখ মুজিব) তখন পাকিস্তানী হানাদারদের হেফাজতে ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তখন ওদের হেফাজতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন। তখনকার তাদের বন্ধুরূপেই পাকিস্তানী হানাদাররা তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরিবারটিকে কোনো কষ্ট স্বীকার করতে দেয়নি। ক'ঘন্টা আগেই দিনের আলো নিভে ঘোর অন্ধকার রাতটি আসবার আগেই শেখ মুজিবের পরিবার পরিজনকে (এমন কি দুগ্ধবতী গাভীটিকেও) ধানমন্ডিতে নিকটস্থ আরেকটি বাড়িতে স্থানান্তরিত করে ও গুছিয়ে বসবার সুযোগ দিয়েছিল। তখন থেকে শেখ মুজিবের পরিবারের নতুন আবাসস্থলে পাকিস্তানী সরকারের সর্বপ্রকারে খরচাদি বহনের হিসেবপত্র তো তখনকার পাকিস্তান সরকারের হিসেব রক্ষণ বিভাগেই মওজুদ রয়েছে। জেনারেল রাও ফরমান আলীর স্মৃতিচারণেও তিনি তথ্যটি প্রদান করেছেন।

পাকিস্তানী হানাদারদের পক্ষ হতে সেই ২৫ মার্চের দিবাগত রাতের শেখ মুজিবের যাতে বেশীক্ষণের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য সন্ধ্যার পরের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে অবস্থানরত-অপেক্ষারত নেতাকে ওরা প্রায় জনশূন্য বাড়িটিতেই এসে পোটলা পুটলিসহ গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এসব ঘটনার স্বীকারোক্তিমূলক সংবাদ রিপোর্ট এযাবৎকাল দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। এসবের অজস্র প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ২৫ মার্চের দিবাগত রাত বারটার আগেই তিনি নিজ গৃহটি হতে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে গেছেন। সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের তারিখটির আগেই তিনি পাকিস্তানীদের হেফাজতে চলে গিয়েছিল। তাই ১৯৭১ সালের সেই ২৬ মার্চে শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার তখন প্রশ্নই ওঠে না। এটা এক পুরোপুরি মিথ্যাচার– যা পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা বিষয়টিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বানোয়াট করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের এক মহানায়ক জেনারেল ওসমানীকেও পরবর্তীকালে তাই এসবের প্রায় সব মিথ্যাচারিতাকেই বানোয়াট মুক্তিযুদ্ধের এসব বাজারী কাহিনীকেই 'রূপকথার কাহিনী' বলে মন্তব্য করতে হয়েছে। আজ সাংবাদিক-লেখক এম. আর. আখতার মুকুলেরা মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যেসব বাজারী বই-পত্রের প্রকাশনা চালাচ্ছেন তাতে এদের বই বিক্রয়ের ব্যবসা ভাল চলছে জেনে আমরা আনন্দিত হতে পারি। কিন্তু আমাদের মহান (একাত্তরের) মুক্তিযুদ্ধের প্রায় কোন সত্যকেই এসব বই. পত্রে তুলে ধরা হয়নি। তা আমরা সবাই জানি।

সত্তরের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয়েও শেখ মুজিব জানতেন যে, হতভাগ্য আগড়তলা ষড়যন্ত্রের প্রধান আসামী শেখ মুজিবকে তখনকার অখণ্ড পাকিস্তানের সত্যিকার ক্ষমতাধর পাঞ্জাবী প্রধান পাকিস্তানী জেনারেল চক্রটি তাঁকে (শেখ মুজিবকে) ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকারের গদীটিতে কিছুতেই বসতে দেবেন না। তখনকার দিনে আমার নিজেরও পিন্ডি-ইসলামাবাদে সাংবাদিকতার পেশাগত জীবনকালটা কাটাবার মধ্যে নানাভাবে তা উপলব্ধি করেছি। স্বকানে শুনে জেনেছি যে, বাঙালী নেতা আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবকে তখনও তারা (পাঞ্জাবী জেনারেলরা) ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগী এজেন্টরূপেই জানেন। তাদের সেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বাস্তব সত্য ছিল, তা আমাদেরও জানা ছিল।

আমাদের অনেকেরই শেখ মুজিব সম্পর্কে এসব (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সংশ্লিষ্ট থাকবার) তথ্য জানবার সুযোগ হয় এবং কিছু খবর তখন শেখ মুজিবের নিজেরও জানতে বিলম্ব ঘটেনি। নির্বাচনজয়ী হয়েও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার পথে তীব্র বাধার তিনি যে-সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন তা জানতেন। তাই তিনি নির্বাচন জয়ের পরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারোহণের পথের বাধা অতিক্রম করতে চাইলেন। তখনই ভবিষ্যত স্ট্রাটেজী ঠিক করে ফেলেছিলেন, এর প্রত্যক্ষদর্শী হবার সুযোগ সৌভাগ্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী পিন্ডি-ইসলামাবাদে অবস্থানের কারণে আমাদেরও হয়েছে।

সত্তরের নির্বাচন জয়ের অব্যবহিত পরেই. রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানী আর্মি হেডকোয়ার্টার্স জি. এইজ. কিউ. তে. লেঃ জেনারেল সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দিন (এস. জি. এম.) পীরজাদার উদ্যোগে সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার বৈঠকে উপস্থিতিতেই উপরোক্ত পাকিস্তানী পাঞ্জাবী জেনারেল চক্রটিকে এক চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছিল। নির্বাচন জয়ের পরও শেখ মুজিবের ন্যায় একজন বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার কথিত এজেন্টকে যে-ইসলামাবাদে ক্ষমতার গদীতে আসিন হতে দেয়া হবে না, সেই সিদ্ধান্তে তখনকার মতো একজন বেসামাল মদ্যপ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সায় দেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

আর উপরোক্ত জেনারেলদের সিদ্ধান্তটির বেশ কিছু তথ্য তখনকার পিণ্ডিস্থ আমাদের অবজারভার পত্রিকা গ্রুপের ব্যুরো চীফ সৈয়দ নজিউল্লাহর তৎক্ষণাৎ জেনে নিতে বিলম্ব ঘটেনি। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরবর্তীকালে ভারত হতে আগত জনৈক ড. জয়ন্ত কুমার রায় ঢাকায় একদিন আমাকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বাসভবনে দেখা করেন। সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌র সঙ্গে পিণ্ডিতে অবজারভার ব্যুরোতে সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্ব এর আগে পালন করেছি তখন শুনেই অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের সামনে বলেন ঃ 'সৈয়দ নজিউল্লাহ্ তো পাকিস্তানী আর্মি ইন্‌টেলিজেন্সের লোক।' আমার পিণ্ডি বাসকালে আগেও একথাটা অনেকসময় জনরবরূপে আমার কানে এসেছিল।)

রাওয়ালপিণ্ডির প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ নজিউল্লাহ সেই গোপন খবরটি অর্থাৎ শেখ মুজিবকে ক্ষমতারোহণে জেনারেলদের বাধা সৃষ্টির সিদ্ধান্তের খবরটি তখনকার রাওয়ালপিণ্ডির একজন বাঙালী (পরবর্তী এরশাদ মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এখনকার 'ডায়লগ' পত্রিকার মালিক) আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এ. আর. এস. দোহার মুখে ঢাকায় নেতা শেখ মুজিবের কানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জনাব দোহা উক্ত সত্তরের আঠারই ডিসেম্বরের পিণ্ডি-ঢাকা পি. আই. এ. ফ্লাইটে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছাতেই তাকে গ্রেফতার করে ফিরতি ফ্লাইটে পিণ্ডিতে নেয়া হয়েছিল এবং প্রধান সহযোগী সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌কে সেই (আঠার তারিখের) দিবাগত মধ্যরাতে পিণ্ডিস্থ

বাসভবন হতে গ্রেফতার করে দু-জনকে একসঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডির বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

এর পরেই তখনকার ঢাকা থেকে প্রকাশিত অবজারভার পত্রিকাটির মালিক এডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরীর টেলিফোনযোগে বিষয়টিতে-বিশেষ করে আমাদের পিণ্ডিব্যুরো প্রধান সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌র মুক্তি প্রয়াসের তদবির চালাবার কথা শুনে তখনকার নির্বাচনকালের রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক অবস্থানরত বন্ধুবর জওয়াদুর রহমানের সঙ্গে নেমে পড়েছিলাম। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউ. পি, আই. পিণ্ডি-ব্যুরো চীফ জনাব আসরার আহমেদ (আসরার ভাই)-এর অক্লান্ত সহযোগিতামূলক পরিশ্রমের ফলে তখন কিছু সময়কালের মধ্যে বিষয়টিতে একটা ফয়সালায় আসা সম্ভব হয়েছিল। গোপন সামরিক আদালতে, 'সামরিক' গোপন তথ্য পাচারের দায়ে দুজনেরই দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়েছিল। তৎপরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী সামরিক জেনারেলদের সঙ্গে জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টোর এক সখ্যতা গড়ে উঠলে আসরার ভাই তাকেও অনুরোধ জানাতে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত পি. পি. পি. নেতা জনাব ভুট্টোর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের ফলেই সৈয়দ নজিউল্লাহ-দোহা কারাদণ্ডভোগের মাঝের এক সময় হতে আগেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে খণ্ডিত পাকিস্তানে ভূট্টো শাসনামলের প্রথমদিকে সৈয়দ নজিউল্লাহ্ সরকারি প্রেস এডভাইজারের পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এর পরে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পত্র-পত্রিকাতে এসবের প্রায় সব খবরই তখন প্রকাশিত হয়েছে।

তখনকার পিণ্ডিস্থ সিনিয়র সাংবাদিক নেতা আসরার ভাইকে সাংবাদিকতার পেশাজীবীর পরিচয়ধারী সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌র মুক্তির জন্য এক প্রয়াস চালাতেও দেখেছি। অপরদিকে তিনি এভাবে দেশে-বিদেশে সাংবাদিকতার পরিহিত আলখেল্লার আড়ালে গোয়েন্দা এজেন্টের কাজকর্মে লিপ্ত সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌দের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করতেন দেখতাম। আমাদের ব্যুরো প্রধান সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌কে তিনি 'দাড়িওয়ালা শয়তান' বলে উল্লেখ করতেন। পিণ্ডিস্থ সামরিক জি. এইচ. কিউ-তে পাকিস্তানী আর্মি গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানের অফিসে আসরার ভাইয়ের সঙ্গে তদবীরকালে আমরা

দলবলে হাজির হতেই গোয়েন্দা কর্মকর্তা রিজভীকে এক ক্রোধের গালাগালিতে ফেটে পড়ে বলতে শুনেছি ঃ এরা (সৈয়দ নজিউল্লাহ্‌রা) ডাবল ক্রস বাস্টার্ড।' অর্থাৎ এরা নাকি দু'দিকেই গোয়েন্দা চরবৃত্তি করে ফায়দা লুটতে চাইছে।

চলমান বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজেও উপরোক্তে শ্রেণীর দু'ধারী গোয়েন্দা চরবৃত্তিতে নিয়োজিতদের সংখ্যা আজ আরও বেশি হয়েছে, দেখা যায়। উপরোক্তদের দুয়েকজন এদের শিরোমনিরূপে সাংবাদিকতার আড়ালে গোয়েন্দা বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে আমাদের তখনকার অবস্থানস্থল রাওয়ালপিণ্ডিতে এসব ঘটনা ঘটছিল, আর সেসব খবর অনতিবিলম্বেই নির্বাচনজয়ী শেখ মুজিবের ঢাকাস্থ অবস্থানে ঠিক পৌঁছে যাচ্ছিল। আর তখনই নিজ ক্ষমতারোহণের স্ট্রাটেজীও শেখ মুজিব ঠিক করে ফেলেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী নেতা, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে ঐ মাথা মোটা পাঞ্জাবী প্রধান জেনারেল চক্রটির তৎপরতার নিকট তিনি সহজে পরাজয় মেনে নিতেও রাজি ছিলেন না।

তাঁর (শেখ মুজিবের) তড়িত গতিতে চালা রাজনৈতিক চালটিতেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। আজকের আওয়ামী লীগ দলনেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর এক রাজনৈতিক চালরূপে এদেশে দীর্ঘ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার নেতা জেনারেল এরশাদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। পিতা শেখ মুজিবের মহাজন পন্থার অনুসরণেই ইনি (শেখ হাসিনা) তা করছেন। তাঁর নির্বাচনজয়ী পিতা শেখ মুজিবকেও সেদিন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতে, আঁতাত গড়ে তুলতে দেখা গিয়েছিল। আমাদের অনেকে তখন হতেই জেনে এর পর হতেই যথাসময়ে লিখে প্রকাশ করে এসেছি।

সত্তরের নির্বাচনজয়ের পরের তড়িৎগতিতে ঘটে যাওয়ার ঘটনাবলির এক সময়ে– ডিসেম্বর মাসটির শেষে শেখ মুজিব তাঁর গোপন দুতিয়ালীর এক ঘনিষ্ঠজন ভাগনে শেখ মনিকে গোপনে ঢাকা থেকে একদিন রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেরণ করেন। সেখানে নিজ দক্ষতার কারণে ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠতা অর্জনকারী প্রধান বাঙালী আমলা রব সাহেবের সহায়তা লাভ করেই শেখ মুজিবের

প্রেরিত সেই দূত তখনই সামরিক শাসক ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পদটির টোপ প্রদান করেছিলেন। আর এতে বেসামাল মাতাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সব কিছু ভুলে সেই টোপটি পেয়ে খুশীতে বাগে-বাগ হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ক্ষমতারোহণের আশাকে বাস্তবায়িত করবার পথে গণতন্ত্রের শত্রু সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিব আঁতাত গড়বার পথটিও ধরেছিলেন। তদীয় কন্যা আজকের আওয়ামী লীগ দলনেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে এক বিবেকবর্জিত চরিত্রহীন সামরিক শাসকের সঙ্গে সেই একই প্রকারের আঁতাত গড়তে জোটবদ্ধ হতে তাই আর দ্বিধাবোধ করছেন না। তখন তাঁর পিতা শেখ মুজিব তাঁর সেই কূটচালে নিজের দেশটিকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। আজ কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর চলতি রাজনৈতিক চালে নিজের বাংলাদেশকেই বার বার বিপর্যস্ত করবার পথে ঠেলে দিচ্ছেন। তবে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে এসব মানবসৃষ্ট বিপর্যয়কে রোধ করা উপর্যুপরি সম্ভব হচ্ছে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে সেসব দিনে আমাদের প্রবাস বাসের চাকলালা রোডস্থ বাসভবনটিতে অপরাহ্নকালের ফ্লাইটে অতিথিরূপে ঢাকা থেকে আগত শেখ মনির প্রথম রাতটিতে অবস্থানের কারণে বিষয়টি আঁচ করতে আমাদের বিলম্ব ঘটেনি। তাছাড়া তখনকার পাকিস্তানের উপরোক্ত প্লানিং কমিশনের সচিব (বর্তমানে মৃত) আবদুর রব সাহেব আমার কিছুটা দূর সম্পর্কের মামা– আমার মরহুম আম্মা আয়েশা মির্জা এবং বর্তমান বেগম খালেদা জিয়া সরকারের প্রবীণতম মন্ত্রী (আমার আপন ছোট মামা) মির্জা গোলাম হাফিজের এক চাচাতো ভাই ছিলেন। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ শাসনামলে পাকিস্তান থেকে রি-প্যাট্রিয়েশনের দলে ফিরে আসবার পরেই তখনবার সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সচিব রব সাহেবকে এক কন্ট্রাক্টে শেখ মুজিব সরকার প্রথম পে-কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম পে-কমিশন রিপোর্টটি প্রস্তুত হবার কিছুদিন পরেই অবসর গ্রহণকারী আমলা রব সাহেব মারা গেছেন। ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রবেশের ইচ্ছাকে তিনি শেখ মুজিবের নিকট প্রকাশ করবার পরেও দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর দেখা পাওয়া যায় নি। কিছু কানাঘুষায় এ কারণটি আমাদের

জানতে দেরী হয়নি। শেখ মুজিব তাঁর দাপটের শাসনের ক্ষেত্রটিতে কোন সৎ দক্ষ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিকে সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য রব সাহেবের ন্যায় একজন যথা নিয়মে অবসর গ্রহণকারী সৎ দক্ষ আমলা-সচিবকে তিনি এড়িয়ে চলবার নীতিতে দৃঢ় ছিলেন। জনাব আবদুর রব পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ির সম্ভ্রান্ত ধনী আইনজীবী ও টি-প্লান্টার খানবাহাদুর আবদুস সাত্তার সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার অগণিত মেধাবী ছাত্রের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্ররূপে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষালাভ করেন বৃটিশ শাসনামলে। সেই বৃটিশ শাসনামলের অন্তিম মুহূর্তে আমি নিজেও জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্র ও নিজ ক্লাশের ফার্স্টবয় ছিলাম। তখন বৃটিশ শাসনামলের জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের একটি মেরিট বোর্ডে উক্ত স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের নামের স্থায়ী তালিকা বর্ষানুক্রমে লেখা রয়েছে। সেই তালিকাটিতে হিন্দু ছাত্রদের নামের ভীড়ে মাত্র দু'জন মুসলমান ছাত্রের নাম লেখা রয়েছে দেখেছি। এর প্রথম নামটি জনাব আবদুর রব-এর। অপর নামটি জনৈক মির্জা ইব্রাহিমের- পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের একজন কর্মকর্তার পদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবার মধ্যেই তিনি রহস্য জনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

বৃটিশ শাসনামলের কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের মেধাবী ছাত্র জনাব আবদুর রব তাঁর মেধার বলে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান শাসনামলেও তিনি ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারে, তখন একজন বাঙালী হয়েও আমলারূপে তাঁর দক্ষতার কারণে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক পিরামিডের প্রায় শীর্ষেই স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই এদেশের রাজনীতিতে এক একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীরূপে পরিচিত। তাঁদের নিজেদের পুত্র-কন্যার এক বিবাহসূত্রে জনাব আতাউর রহমান খানের ন্যায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীও তাঁর নিজের বেয়াই। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের আশা নিয়ে তিনি শেখ মুজিবের ন্যায় একজন নিম্ন মেধার ভুল নেতৃত্বের ফাঁদে নিয়ে নিজেকে ফেলেছিলেন। আর শেষ জীবনে চরম প্রতারিত হয়েছেন বলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে

দেখা গিয়েছিল। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠ জনদের সবাই তা জানেন।

উপরোল্লিখিত সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী ডিসেম্বরের শেষদিকে ঢাকা থেকে পিণ্ডিতে আগত রাতের অতিথি শেখ মনিকে পরদিন সকালেই আমি ইসলামাবাদস্থ সচিব মহল্লায় রব সাহেবের সরকারি বাসভবনে ট্যাক্সিযোগে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান তাঁর 'জেনারেলস ইন পলিটিকস' শীর্ষক বইটিতেও জেনারেল ইয়াহিয়া কথিত এক ভাষ্যরূপে তুলে ধরে লিখেন, সত্তরের নির্বাচনজয়ী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাকে (তখনকার সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে) পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পদটি প্রদানের লোভনীয় টোপটি দিয়েছিলেন এবং তিনি (শেখ মুজিব) তা একাত্তর সাল আসবার আগেই অর্থাৎ সত্তরের ডিসেম্বর নির্বাচন জয়ের পরেই নিজের প্রেরিত বার্তাবহ দূত শেখ মনিবের মাধ্যমে প্রস্তাবটি প্রেরণ করেছিলেন। তখনকার পাকিস্তান সরকারের উপরোক্ত শীর্ষস্থানীয় বাঙালী আমলা রব সাহেবের মাধ্যমে রাওয়ালপিণ্ডিস্থ হাউসে ইয়াহিয়া খানের নিকট একান্তে প্রস্তাবটি পৌঁছে দেয়া হয়েছিল।

এর সামান্য ক'দিনের মধ্যেই ইয়াহিয়ার নিজের কারণেই বিষয়টি আর বেশিদিন অজানা থাকেনি। তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খাঁনকে নাকি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজেই শেখ মুজিবের প্রস্তাবটির কথা বলে তাকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন। তাঁর 'জেনারেলস ইন পলিটিকস' বইটিতে জনাব আসগর খান লিখেছেন। (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জন পরবর্তী ঢাকায় এসে আমি আমাদের দেশের সাংবাদিকতার এক পথিকৃত জনাব আবুল মনসুর আহমদের সঙ্গে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতকালে কথাচ্ছলে বিষয়টি তাকে বললেও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।) পরবর্তীতে ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিবের উপরোক্ত প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করবার টোপ প্রদানের বিষয়টি আরও বহু তথ্য প্রমানসহ প্রকাশ পেয়েছে।

সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তখনই যদি পাকিস্তানের প্রকৃত ক্ষমতাধর পাঞ্জাবী জেনারেল চক্রটির বিশেষ করে ঐ চক্রটির শিরোমনিরূপে পরিচিত লেঃ জেনারেল সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দিন (এস. জি. এম.) পীরজাদাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রীত্বের পথ সুগম করতে পারতেন তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব জাতীয় সংসদে তাঁর আওয়ামী লীগ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই করতেন।

আর সেই 'জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট' পাকা করতেই এর পরেই ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মধ্য জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক সফরে এসেছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা সাক্ষাত চূড়ান্ত বোঝাপড়া শেষে রাওয়ালপিণ্ডি হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে যাবার পথে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সামনে 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' গদগদভাবের কথাটি বলেছিলেন। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তৎক্ষণাৎ সোচ্চারভাবে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য পাকিস্তানী জেনারেলদের চক্রটি তখন এতে সম্মতি না-দিলে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ কখনও সহজ ছিল না।

এতে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি. পি. পি.) নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক দারুণ আশাভঙ্গ ও মর্মপীড়ার কারণ ঘটে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হবার পরেই যেভাবেই হোক রাজনৈতিক ক্ষমতায় তখনই অংশ লাভের ইচ্ছা প্রবলভাবে ভুট্টোর মধ্যে কাজ করছিল। তাই দুই নির্বাচনজয়ী নেতার ক্ষমতার ভাগাভাগির কাড়াকাড়িতে শেখ মুজিবের পাকিস্তানী রাজধানী ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীটিতে তখনই বসতে যাবার পথটি বিলম্বিত হয়েছিল। ভুট্টোর চক্রান্তেই তা হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে নিজেদের দেশটিকে উচ্ছন্নে যেতে দিতেও এদের কারও আপত্তি ছিল না। নিজের দেশের অথবা প্রতিবেশী দেশের সেনাভিযানের তথা মার্সিনারী সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে ক্ষমতা দখলেও এদের যে আপত্তি ছিল না তা ১৯৭০-৭১ সময়কালের পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে এই দুই রাজনৈতিক দলের দুই শীর্ষ নেতার দুঃখজনক আচার আচরণেই প্রকটরূপে দেখা গিয়েছিল।

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের অব্যবহিত পরের সময়কালটিতে একমাত্র নিজ স্বার্থ উদ্ধারের লোভেই শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীটিতে বসতে দেবার জন্যে যে আকুল হয়েছিলেন তখনকার পিণ্ডিতে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আমরা সবাই তা দেখেছি। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুসরণে যদিও তা ন্যায়সঙ্গত ছিল। তাই জানুয়ারীর ঢাকা সফর শেষে, ভুট্টোর পরামর্শ-আবদার উপেক্ষা করেও ৩ (তেসরা) মার্চ পাকিস্তানের নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন তখন ঢাকায় আহ্বান করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সর্বপ্রকাশের কূটকৌশল প্রয়োগ করে ইয়াহিয়া-শেখ মুজিবের সেই সামরিক দ্বিপাক্ষিক আঁতাতকে ভেস্তে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বের আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা পাকিস্তানী জেনারেলদের নিকটেও অজানা ছিল না। এ-বিষয়টির যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণও নাকি তাদের নিকটে রয়েছে। শেখ মুজিবের ন্যায় এরকম একজন বিদেশী (ভারতীয়দের) সরকারের গোয়েন্দা চরকে পাকিস্তানী পাঞ্জাবী প্রধান জেনারেলের দলটি কতটা সন্দেহ-সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন তা আমাদের পিণ্ডি-ইসলামাবাদে তখনকার দিনের সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্বপালনকালেই লক্ষ্য করেছি। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবকে খালাস করে দেবার জন্য শক্তিশালী পাকিস্তানী জেনারেল চক্রটির ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট আইউবকে বারবার দোষারোপের বিষয়টিকে এর পরে কখনই তাদের গোপন রাখতে দেখিনি। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় যেভাবেই হোক শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে আইউব নাকি এক চরম ভুল করে গেছেন, জেনারেলের দলটি এবং তাদের পাঞ্জাবী রাজনীতিক-সমর্থকরা প্রকাশ্যে এরূপ মত প্রকাশ করতেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তার কূটকৌশলের চালরূপে পাঞ্জাবী প্রধান পাকিস্তানী জেনারেল চক্রটির শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সন্দেহ-সংশয়কে আরও উসকে দেবারই পথটি ধরলেন। এতে নিজের (অনেকটাই অযৌক্তিক) রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইলেন।

এতে দীর্ঘদিনের সামরিক আইনের জংলী শাসন হতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আরও বিলম্ব ঘটবার আশংকাও প্রকট হয়েছিল। তখনকার দেশের-বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্রের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬৮-৬৯-এর আন্দোলনে গণ-অভ্যুত্থানের এক চরম পথ ধরেছিলেন। আর সেই মুহূর্তে ভুট্টোর চক্রান্তে ও পাঞ্জাবী জেনারেল চক্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের চাপে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় পূর্বাহূত জাতীয় সংসদের ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন।

এতে উপরোক্ত গণ-আন্দোলনের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়েছিল। তখনই ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে যেন এক স্বাধীনতা ঘোষণার পথটিকেই ধরলেন। তার স্বতঃস্ফূর্ততা ও তীব্রতা নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিবসহ ওদের সবাইকে তখন হকচকিয়েই দিয়েছিল। স্বাধীনতার সেই গণদাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ছাড়া ঐ মুহূর্তে সেই নেতৃত্বের সামনে অন্য আর কোন পথ খোলা ছিল না।

নির্বাচনজয়ী শেখ মুজিব তাঁর সুযোগ সন্ধানী মনোভাবকে তখন অন্তরে চেপে স্বাধীনতার গণদাবির সঙ্গে (কৃত্রিম) একাত্মতার ভাব প্রদর্শন করলেন। সেই সময়কালটিতে ৭ মার্চের রমনা ময়দানের তাঁর উচ্চগ্রামের বক্তৃতার ন্যায় একটি কূটকৌশলী গলাবাজিকে বিশ্বের আর কোথায়ও স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য একটি 'স্বাধীনতা ঘোষণা' বলে গণ্য করা হয়েছে কিনা জানি না। ৭ মার্চের রমনা ময়দানের শেখ মুজিবের সেই অতি নিম্ন মেধায় চরম সপ্তগ্রামে তোলা গলাবাজিকে আজ যত্রতত্র আরও বিকৃতাকারে যন্ত্রে প্রচার করতে শেখ হাসিনার আওয়ামী দল লজ্জাবোধ করছেন না। কিন্তু এক সাগর বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশী জাতিটিকে এতে লজ্জাবোধ করতে হচ্ছে। সপ্তগ্রামে তোলা শেখ মুজিবের সেই গলাবাজির বিষয়টিকে ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক প্রতিভাবান লেখক সমর সেনসহ অনেককেই নিজ নিজ লেখালেখিতে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতেও তখন শুনেছি। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের ন্যায় একটি নিম্নমানের গলাবাজি নাকি আমাদের মর্যাদাবান বাংলাদেশী জাতির মহান স্বাধীনতার ঘোষণা হতে পারে!

শেখ মুজিব তখনকার গণবিস্ফোরণের মুখে রমনা ময়দানে লোক জড় করে সেই ৭ মার্চের গলাবাজি করেছিলেন। এর পরের মধ্য মার্চ থেকেই (ইয়াহিয়ার ঢাকা সফরের প্রাক্কাল থেকেই) আবার যেন পিছিয়ে পড়বার পথটি ধরেছিলেন।

সিংহকণ্ঠ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী তাঁর সেই বৃদ্ধ বয়সকালেই আবার পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচারের সফর অভিযানে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া ঘরে ফিরবেন না।

অপরদিকে রমনার প্রেসিডেন্ট হাউসে আমন্ত্রিত নির্বাচনজয়ী নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদলাভের আপোষ আলোচনায় নবোদ্যমে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। ঢাকায় তখন আগত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রথমে দ্বিপাক্ষিক এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভুট্টোকে ডেকে নিয়ে এসে ত্রি-পাক্ষিক আপোষ আলোচনা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাগাভাগির ফরমূলাও নাকি সেসব আলোচনার মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছিল। (আজ পর্যন্ত সেই ফরমূলাটির কোন কিছুতেই জনগণকে আস্থার মধ্যে নিয়ে এদের কেউই কোন কিছু প্রকাশ করেন নি। তখনকার প্রায় প্রতিদিন শেখ মুজিব বৈঠক শেষে রমনা প্রেসিডেন্ট ভবন হতে বের হয়ে এলে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের আগ্রহ ভরা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। আর শেখানো বুলীর মতো করে একটি কথাই বলতেন যে, আলোচনার সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে। ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব-ভুট্টোর আলোচনার 'সন্তোষজনক' সেই অগ্রগতিটির ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বসম্মতিক্রমেই ঐ সময়কালের কালো ইতিহাসের ২৫ মার্চের গণহত্যাভিযান শুরুর ভয়ংকর রাতটির কি সৃষ্টি করা হয়েছিল? এটাও ইতিহাসের এক জিজ্ঞাসা। ইতিহাসের আর সব জিজ্ঞাসায়ই যেমন যথাকালে জবাব মেলে আমাদের উপরোক্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসার জবাবও ক্রমাগতই বের হয়ে আসছে। সেসব দিনের আলোচনায় রত বাঙালী নেতা শেখ মুজিবেরও সম্মতিতেই পাকিস্তানী আর্মির পরবর্তী বাংলাদেশে ক্রাক ডাউনটি সংঘটিত হয়েছে।

চরম পাকিস্তানী বিশ্বাসঘাতকমূলক হামলার মুখে ফেলে বাঙালী নেতা শেখ মুজিব তখন স্বেচ্ছায় তাদের একজন পক্ষাবলম্বীরূপেই হানাদারদের

সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আর সেই শেখ মুজিবকেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের আজ 'জাতির পিতা', 'বঙ্গবন্ধু', 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি' বলে এদেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিক লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী দাবি তোলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছেন। সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন বাংলাদেশের মানুষের তখনকার চরম স্বাধীনতা অর্জনের দাবি সংগ্রামের কারণে তাঁর (শেখ মুজিবের) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রাপ্তিযোগ তখন ভেস্তে যাচ্ছে আশংকা করেই পাকিস্তানী হায়েনাদের সূচিত সেই বাঙালী শায়েস্তা করবার অভিযানে তিনি (শেখ মুজিব) নিজেও সায় দিয়েছিলেন। এতে স্বাধীনতাকামী 'বেয়াদব' পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাঙালীর দল উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে ঘরে উঠে যাবে। জলন্ত অবস্থাটিকে এর মধ্যে স্বাভাবিক করে- পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীতে নির্বাচনজয়ী শেখ মুজিবকে আসিন করা হবে। এটাই তো তাদের উপরোক্ত আপোষ ফরমূলার অন্তর্গত ছিল।

পাকিস্তানের গদীটিতে যেকোন প্রকারে বসবার জন্য শেখ মুজিব একাত্তরের ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে জাতির প্রতি এক চরম বিশ্বাস ঘাতকতার কাজই কেরেছিলেন। তিনি তখন যে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী ইয়াহিয়া-ভুট্টোদের মধ্যেকার স্বীকৃত ফরমূলা অনুযায়ী পাকিস্তানীদের সঙ্গে তখন চলে গিয়েছিলেন, ('আত্মসমর্পণ করেছিলেন' বলা গেলেও বিষয়টিতে 'গ্রেফতার হয়েছিলেন' বলা যায় না।) তাই তখন স্বাধীনতার ঘোষণাটি তাঁর মুখ হতে বের হবে, আমাদের অনেকেই শেষ সময়কালটি পর্যন্ত ব্যর্থ প্রত্যাশা করে পরে বাস্তব অবস্থাটি বুঝেছিলাম। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের পাকিস্তানে প্রদত্ত জবানবন্দীর বিষয়বস্তু ও অন্যান্য অজস্র দলিলপত্র থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। একাত্তরের সেই চরম ২৫ মার্চের রাত থেকেই বাঙালী নেতা মুজিব পাকিস্তানীদের এক সহযোগীরূপেই নিজের তৎপরতাকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। নিজে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব পাবার আশ্বাসরূপী টোপটি তখন গিলে জাতিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তোপের মুখে ছেড়ে দিয়ে যান। এ কাজটি বাংলাদেশী জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

আর বাংলাদেশী জাতির প্রতি তাঁর এসব লোভ হাসিলের অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ জানাবার মতো নেতৃত্বের প্রতীক মওলানা ভাসানীকেও এক ভয়ংকর

ফাঁদে ফেলবার চক্রান্ত তখনই তিনি (শেখ মুজিব) করেছিলেন। মার্চের ঐ স্বাধীনতা প্রচারের দিনগুলোতে সংগ্রামী মওলানা ভাসানীর ঝড়ো অভিযানে সমমনা পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাঙালী নেতা শেখ মুজিবকেও বিব্রতবোধ করতে দেখা যায়। সেই মার্চের ২০, ২১ তারিখে চট্টগ্রামে লাল দীঘি ময়দানে মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতা বাণী প্রচারের জন্য আয়োজিত জনসভাটি একদল 'শক্ত পেশী' যুবক সভামঞ্চের মাইক, টেবিল, চেয়ারসহ ভেঙ্গেচুরে পণ্ড করেছিল। তখন চট্টগ্রাম সফররত মওলানা ভাসানীর সঙ্গে টেলিফোনে শেখ মুজিব কথা বলে- অনুরোধ জানিয়েও স্বাধীনতার বাণী প্রচার থেকে তাঁকে (মওলানা ভাসানীকে) বিরত করতে পারেন নি। তখনই চট্টগ্রামে (নিজের ভগ্নীপতি) আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও আবদুস সামাদ (আজাদ)-কে মওলানা ভাসানীকে ঢাকায় ফেরৎ নিয়ে যাবার নামে ফাঁদে আটকে ফেলবার জন্য সেখানে অনুরোধ জানাতে পাঠিয়েছিল।

বাংলাদেশের আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের তথা মহান সংগ্রামের আগাগোড়াই নেতৃত্বপ্রদানকারী মওলানা ভাসানী তখনকার শেখ মুজিবের সেই পাতা ফাঁদে পা দেননি; তা এড়িয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই বৃদ্ধ বয়সের ভার উপেক্ষা করে এতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালের একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়ের আজও মর্যাদা ভোগ করছেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ক্রোধে ক্ষোভে মওলানা ভাসানীর সন্তোষস্থ পর্ণকুটিরটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আর সপরিবারে শেখ মুজিবের সব জানমালকে এরাই (হানাদাররাই) নিজেদের সযত্নে হেফাজতে রেখেছিল।

[৫]

বাংলাদেশের ইতিহাসের মহা গৌরবময় উল্লেখযোগ্য কাল ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি বছর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের বছর।

একাত্তরের বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টির বছরটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের এতে ভূমিকা পালনের কথাটিকেও প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আমাদের সবার চিরকাল মনে থাকবে। এক একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সেই বিষয়টিকে আমাদের দেখাশোনায় তেমন কোন ভুলের অবকাশ নেই। তাই শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী বলয়ের রচনা করা মুক্তিযুদ্ধের বানোয়াট কাহিনীসমূহকে আমরা কেউই সেভাবে মেনে নিতে পারছি না। বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ করে ভারতের ইন্দিরা সরকার আমলে 'র' (রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং) নামের সৃষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাটির অর্থ সাহায্যপুষ্ট 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'-এর মহান মুক্তিযোদ্ধারূপের ভাবমূর্তিকে বানোয়াট করবার কাহিনীসমূহকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীরূপে আমরা প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দল কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তাই আজও প্রকৃত সত্যকে বাধ্য হয়েই তুলে ধরছি।

সত্তরের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের ২৪ (চব্বিশ) বছরের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম নির্বাচন। পাকিস্তানের ইতিহাসের সেই উল্লেখযোগ্য সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর আওয়ামী লীগ দলকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আওয়ামী লীগ দলকে নিয়ে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদানের জন্য যেসব সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ এদেশবাসী তখন গ্রহণ করেছিলেন তার একটি ছিল মওলানা ভাসানীর তাঁর নিজের পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টি (ন্যাপ) দলকে নির্বাচন থেকে সরে থাকবার নির্দেশ। তাতে নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর আওয়ামী লীগ দলকে নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে সচেতন জনগণের দ্বিধাহীন ভোটে জয়লাভ করেন এবং পাকিস্তান জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।

তখনকার পাকিস্তানের প্রচলিত (শাসনতান্ত্রিক) গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুযায়ী দেশের নির্বাচিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ দলনেতা অর্থাৎ সংসদীয় দলনেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করবেন, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীনশিন হয়ে বসবেন– এটা ছিল স্বাভাবিকভাবেই একটা ন্যায়সঙ্গত ধারণা। এদেশের জনগণ সেজন্যই তাঁকে সচেতনভাবে ভোট প্রদান করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখন দিয়েছিল। (অবাধ নিরপেক্ষভাবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এদেশের লোক তেমন কোন ভূল এর আগেও কোন দিনই করেনি)।

সুতরাং উপরোক্ত একাত্তর সালে সূচনার মুহূর্তে নিজ অন্তরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসবার ন্যাসসঙ্গত (জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত) ধারণাকে শেখ মুজিব ধারণ করেছিলেন। মানসিকভাবে নিজেকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন বললেও তাতে ভুল হবে না। আর একাত্তরের সেই সূচনার মুহূর্তটি হতে অব্যাহতভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাররূপে তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎপরতা চালিয়েছিলেন। সেই একাত্তরের শেষ দিনটি পর্যন্ত এতে অন্যথা ঘটেছে তার কোন দালীলিক তথ্য-প্রমাণ বা যুক্তিসঙ্গত দাবিকে আজ পর্যন্ত ঐ আওয়ামী বলয়টিও তুলে ধরে দেখাতে পারেন নি। শুধু রূপকথার কাহিনী ঠাকুরমার ঝুলির কাহিনীর ন্যায় কাল্পনিক কথামালার সৃষ্টি করে ইতিহাস। তখন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা যায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে আমরা সবাই তখন থেকেই প্রায় প্রতিটি মুহূর্তের এক একজন অংশগ্রহণকারী প্রত্যক্ষদর্শীরূপে এর সবকিছুকে দেখেছি। তখন থেকে যারা আগাগোড়া লিখে বা অন্যভাবে দলিল রেখে এসেছি আজও স্বজ্ঞানে জীবিতাবস্থাতে রয়েছি বলে তাদের কারো বানোয়াট

মিথ্যা কাহিনী-রূপকথার কাল্পনিক কাহিনী বিশ্বাস করছি না। দলিলপত্রের সব কিছুই তো আজও মজুত অবস্থাতে রয়েছে। সুতরাং দলিলপত্রের প্রমাণাদি নিয়ে ইতিহাসবিদরা যখন বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখছেন তখন শেখ মুজিবের তখনকার ভূমিকাটিকেও যথাযথভাবেই লিখতে হচ্ছে। আর তাতে লিখতে হচ্ছে যে, নির্বাচন পরবর্তী একাত্তরের শেখ মুজিবের রাজনীতি ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদটিতে বসবার ন্যায়সঙ্গত দাবিটি আদায়ের রাজনীতি। তাই তিনি তখন (একাত্তরের) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। কারণ একই ব্যক্তি (আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব) একই সময়ে পাকিস্তানের অখণ্ড পাকিস্তান নামক তখনকার দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পদটিতেও বসতে চাইবেন, আবার সেই (অখণ্ড) পাকিস্তান নামক দেশটিরই 'বিচ্ছিন্ন' বাংলাদেশ নামক অংশটির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও আন্তরিকভাবে নিজেকে রেখেছিলেন বলে দাবি জানাবেন, এটা এক অবাস্তব কল্পনার কথা। সোনার পাথরবাটি হয় না বা কাঁঠালের আমসত্ত্বও হয় না। অবাস্তব কল্পনাজাত বিষয়টিকে আজ আওয়ামী বলয়টি আমাদের ইতিহাসরূপে মেনে নিতে বলছেন– যা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

একাত্তরের প্রথম দিনটি থেকে শেখ মুজিব নিজেকে (অখণ্ড) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে ভেবে নিয়েছিলেন। বছরের শেষ দিনটি পর্যন্ত (বহির্বিশ্বের তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলে) নিজে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার ভাবনাটিকে তখনও ছাড়তে পারেন নি। তাই বাংলাদেশ পাকিস্তানী হানাদার মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি ছিলেন না। এর বিপরীতে একটি দলিলপত্রের প্রমাণও আওয়ামী বলয়টি হাজির করতে সক্ষম নন। আর তা নেই বলেই তারা সক্ষম নন।

একাত্তরের পাঞ্জাবী প্রধান পাকিস্তানী জেনারেল চক্রটি তাদের তখনকার দেশেরই একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অংশের উপরে বাঙালীদের বিরুদ্ধে নিজ সেনাবাহিনীকে নৃশংস হত্যা-ধ্বংসাভিযানে লেলিয়ে দিয়েছিল। তখনকার জাতীয় জীবনের সেই চরম মুহূর্তটিতেও আওয়ামী নেতা শেখ মুজিব তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসবার ভাবনাটিকে নিজের অন্তর হতে দূর

করতে পারেন নি। শেখ মুজিবের স্বপ্ন দেখার কথাটি থেকে অনেক সত্য কথাই ঐ সময়ের মধ্য একাত্তরের পাকিস্তান বাসকালের বিশেষ সময়ে তিনি (শেখ মুজিব) নিজ জবানবন্দীরূপে সেখানে রেকর্ডবদ্ধ করে রেখে এসেছেন। তিনি পাকিস্তানের নির্বাচনজয়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন তথা এক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতা হতে যাবেন, তাঁর সেই কথাটাই সত্য। (শেখ মুজিব তাঁর এই মধ্য একাত্তরের পাকিস্তান বাসকালে যখন উপরোক্ত জবানবন্দীটি নিজেই প্রস্তুত করছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে, এদিকের যশোরের প্রবীণ আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য এডভোকেট মশিউর রহমানের মতো তাঁর দলের ঐ পর্যন্ত কতজনকে পাকিস্তানী নৃশংস হানাদাররা হত্যা করেছে?)

ইতিপূর্বের একাত্তরের ২৪ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের দিবাগত সন্ধ্যারাতের ক'ঘন্টা ছিল রমনা প্রেসিডেন্ট ভবনের আলোচনায় তখনকার মতো প্রত্যাখ্যাত শেখ মুজিবের বিদ্রোহ ঘোষণার চরম সময়কাল। আসন্ন আর্মী ক্রাক ডাউনের (২৫ মার্চের কালোরাত্রি সৃষ্টির) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট চরম সাজ সাজ আয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন পৌছেছিল। তখনকার যেকোন মুহূর্তে আর্মী ক্রাক ডাউনের আদেশ প্রদানের কমান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আর প্রয়োজন নেই বলে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এসব অশুভ আলামত নিজে দেখা ছাড়াও নানা সূত্রে আসন্ন ক্রাক ডাউন সম্পর্কে, যথাসময়ে নেতা শেখ মুজিবের নিকটে প্রায় সব নিশ্চিত খবরই পৌছেছিল।

উপরোক্ত চরম মুহূর্তের সময়কালটিতেও শেখ মুজিব শুধুমাত্র নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর তখনকার সময়কালটির 'বন্ধু' পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি. পি. পি.) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তার 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডী' শীর্ষক বইটতে শেখ মুজিবের নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের ও তা (শেখের উদ্বেগ) অচিরে নিরসনে তাঁদের যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণেরও এক খোলামেলা বিবরণ লিখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসির লেখা টাইম পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণেও তিনি শেখ মুজিব ও তাঁর

পরিবারের নিরাপত্তা প্রদানে ভুট্টোর যথার্থ 'অবদান' রয়েছে লিখেছেন। তখন ঢাকায় শেখ মুজিব ভুট্টো হোটেলে সন্ধ্যাকালীন মদ্যপানের আসরে প্রতিদিন একান্ত বসতেন বলে সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসি লিখেছেন।

বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত বাংলার মুসলমানের সাংবাদিকতার এক পথিকৃত প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা (বর্তমানে মৃত) জনাব আবুল মনসুর আহমদ। তিনি ৭১-এর মার্চ মাসের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এর পরে লিখেছেন ঃ (উক্ত মার্চের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ বাংলার সকল জাতীয় নেতাই শেষ পর্যন্ত মনেপ্রাণে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক ফেডারেশন হিসেবে পাকিস্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন যে স্বাধীনতার অগ্রনায়ক আওয়ামী লীগ, তারাও বাংলার স্বাধীনতার দাবী করেন নাই....৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক অভিযানের আগেতক স্বাধীনতার কথা কেউ বলেন নাই।...যে দুই একজন পূর্ব পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা বাংলার স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিলেন, তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপস করিতে পশ্চিমা নেতাদের চাপ দেওয়া। (শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু-পৃষ্ঠা-১১)

সত্তরের নির্বাচনজয়ী শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করে রাজধানী ইসলামাবাদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেবার জন্য তখনকার আওয়ামী লীগের পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখবার রাজনীতি তখন পর্যন্ত (একাত্তরের ২৫ মার্চের দিনটি পর্যন্ত) শুধু তাদের দলীয় নয়– পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতির জন্যও সঠিক ছিল। পাকিস্তানী পাঞ্জাবী প্রধান জেলারেল চক্রের প্ররোচনায় তাদের পুতুল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে দেশের এই অঞ্চলে হিংস্র অগ্নিবর্ষী গোলাগুলি চালিয়ে হত্যাভিযানের নির্দেশ না দিলে শেখ মুজিব ও তার উপরোক্ত এর আগের রাজনীতি সঠিক ছিল বলতে দ্বিধা নেই।

উপরোক্ত ২৫ মার্চে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এদেশবাসীর শত্রুরূপে এক বর্বর হত্যা ও ধ্বংসাভিযানের আদেশ প্রদান করেই ঢাকা থেকে বিমানযোগে স্বদেশে ফিরে চলে গেলেন। পাকিস্তানকে নিজেরাই ধ্বংস করতে চরম আঘাতটি দিয়ে গেলেন।

তখনকার মুহূর্তে যেকোন প্রত্যুৎমতিসম্পন্ন সঠিক নেতৃত্বের তরফ হতে আক্রান্ত জাতিটির নিকট এক প্রতিরোধের পথনির্দেশ আসা উচিত ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব সেই পাকিস্তানী বর্বর আক্রমণের আশংকা হতে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরিবারটিকে মুক্ত রাখতে ঢাকায় তাদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থাটুকুই শুধু করলেন ও পাকিস্তানী হানাদারদের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের সঙ্গে নিজেও চলে গেলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন বলে তখনকার নিজ সৃষ্ট দলিলপত্রও তো তিনি (বাংলাদেশের ক্ষমতাসিনতার নিজ আমলেও) বিশ্বাসযোগ্যরূপে হাজির করতে পারেন নি।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের অরাজনৈতিক (বিজ্ঞানী) জ্যেষ্ঠ জামাতা ড. মোহাম্মদ ওয়াজেদ মিয়াও তো বলেছেন ঃ জিয়া সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুর।' ড. ওয়াজেদের মতে, বঙ্গবন্ধু তখন প্রায়ই অস্থিরচিত্তে বলতেন যে, আমার দেশের সৈনিকের মধ্যে এমন একটি রেজিমেন্টও কি নেই। যেখানে আমি গিয়ে নিশ্চিন্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারি? এমন কেউ নেই যারা এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে যেতে পারে।'

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সেই কথিত স্বগতোক্তি-ইচ্ছাপূরণরূপেই তো এগিয়ে এসে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিক মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রটি হতে সেই স্বাধীনতা ঘোষণার সঠিক কাজটি করেছেন। জেনারেল (অব.) শফিউল্লাহসহ অন্যান্য সবাই এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন আজও এঁরা বলছেন। এক মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়বহনকারী জনৈক মেজর (অব.) রফিক বিদ্রোহ স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষনার আইনকানুনের হঠাৎ করেই আজ যেন একজন বিশেষজ্ঞ সেজে বসেছেন। আর বলতে শুরু করেছেন যে, সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্যেরই (বিদ্রোহ ঘোষণাসহ) স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা বৈধ নয়।

তখনকার মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে উক্ত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক জিয়া যদি ব্যর্থ বিদ্রোহের দায়ে পাকিস্তানী (হানাদার) সেনা বাহিনীর হাতে ধরা পড়তেন তখন তো তারাই কোর্ট মার্শালের বিচারকালে ঐ কথা বলে (বৈধ কাজ করেন নি বলে) বিদ্রোহী জিয়াকে তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে খাড়া করে হত্যা করতেন। বাংলাদেশী

জাতির জন্য জিয়া তৎমুহূর্তে এক অসম সাহসী কাজ করেছেন। আর এই বাংলাদেশেরই একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়ধারী মেজর (অব.) রফিক (পাকিস্তানীদের সেই যুক্তির অনুসরণে) বলছেন যে, তা বৈধ হয় নি।' কী দারুণ ঈর্ষাকাতরতা!

মেজর (অব.) রফিকদের আজকের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতিক নেতা শেখ মুজিবেরই তো তখন সেই 'বৈধতা' ছিল বলে বিষয়টি ধরা পড়েছে। তখনকার সেই চরম মুহূর্তে তিনি (শেখ মুজিব) নিজেও সেই বিদ্রোহ স্বাধীনতা ঘোষণার 'বৈধ' কাজটি করেন নাই কেন? তখনকার কোন্ চিন্তায় তিনি (শেখ মুজিব) তা করেন নি। তখন তো তিনি দেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় নেতা ছিলেন।

এর আসল তথ্য তো ভারতীয় লেখক অশোক রায়না তাঁর 'ইনসাইড র' শীর্ষক বইটিতেও এভাবে লিখে ফাঁস করেছেন ঃ আগে আগড়তলা ষড়যন্ত্রের অর্থাৎ ভারতীয় সশস্ত্র সেনাভিযানের ন্যায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শেখ মুজিবদের এক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতার গদী লাভের ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতিকাল হতেই– 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরুর অনেক আগে থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা (পরবর্তীকালের 'র') সংস্থার একজন চররূপে সীমান্ত ওপারের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের (শংকর নায়ার-কর্নেল মেননদের) সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।' আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাইমেন সাহেব তাঁর 'দুই দশকের স্মৃতি' শীর্ষক বইটিতে শেখ মুজিবের নিজ মুখের স্বীকারোক্তিরূপেও তা তুলে ধরেছেন।

ভারতের ইন্দিরা সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা তখন একমাত্র পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করবার হিংসাত্মক প্ল্যান নিয়ে শেখ মুজিবকে এজেন্টরূপে রিক্রুট করেছিলেন। এ যাবৎকালের উপরোক্ত নানা প্রকাশিত তথ্যে তা আজ পরিস্কার হয়েছে।

পাকিস্তানী ফৌজী হানাদারদের নির্বুদ্ধিতামূলক বর্বর আক্রমণ এখানে শুরু হতেই তখনকার ভারতের রাজধানী দিল্লীর ইন্দিরা সরকারের সামনে 'শতাব্দীর সুযোগটি এসে গিয়েছিল। আর বিষয়টিতে এর পরে মন্তব্য প্রকাশ করে ভারতের এক প্রবীণ সাংবাদিক ও ইংরেজী ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মিঃ সমর সেনও তখনকার (একাত্তরের যুদ্ধকালীন) ভারতের সেনাপ্রধান মানেকশ-এর বক্তৃতার এক উদ্ধৃতি তুলে লিখেছেন ঃ 'দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রী পরিষদ তাকে (মানেকশকে) তখনই (একাত্তরের ২৫ মার্চের পরেই) সেনাভিযানে প্রেরণ করে ঢাকা দখল করতে বলেছিলেন'। (সমর সেনের কলকাতায় প্রকাশিত 'বাবু বৃত্তান্ত')।

ভারতীয় অশোক রায়না তাঁর উপরোক্ত 'ইনসাইড র' বইটিতে লিখেছেন ঃ চট্টগ্রামে যখন পাকিস্তানী সৈন্য মাঠে নেমে পড়ে তখন ঢাকায় র-অপারেটরদের দিল্লী থেকে পাওয়া বার্তানুযায়ী আদেশ পালনে পাগলপারা অবস্থা হয়। তারা দীর্ঘ বারো ঘন্টা ধরে শেখ মুজিবকে (পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে) ঢাকা ত্যাগ করার অনুরোধ করতে থাকে। মুজিব জেদের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টার মাধ্যমে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।............মুজিব নিজে পাকিস্তানীদের সঙ্গে যাবেন আর বিপর্যয় (অর্থাৎ, পাকিস্তানী আর্মী ক্রাক ডাউনের) মাত্র কয়েকঘন্টা পূর্বে শেখ মুজিব তাঁর কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকে সীমান্ত পারের ভারতভূমিতে যাত্রার অনুমতি দেন। তাঁরা হলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ (যিনি এর পরে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন), আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় যারা 'র' এজেন্টের সাথে সারারাত ভ্রমণ করেন ও 'মুজিব নগরে' এক সময়ে এসে পৌঁছান। আর সেই প্রবাসে 'বাংলাদেশ সরকার' গঠন করেন।

বইটিতে কাদের সিদ্দিকী, খালেদ মোশাররফসহ বেশ ক'জনকে ভারতীয় গোয়েন্দা 'র' সংস্থার যোগসূত্র ছিলেন চিহ্নিত করে লেখা রয়েছে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযোদ্ধারা যখন নিজেদের সংগঠিত করছিলেন, ফ্রন্টে ফ্রন্টে যুদ্ধে হানাদারদের পর্যুদস্ত করছিলেন, তখন ভারত সরকারের আশ্রয়ে উপরোক্ত আওয়ামী নেতৃবৃন্দ কলকাতায় বসে বসে কি করছিলেন এর অজস্র বিবরণ এযাবৎকাল প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাক্কারজনক সেসব বিবরণও আর এস্থলে তা-ই পুনরাবৃত্তি নাই-বা করলাম। এসব ব্যক্তিচক্রের 'মুক্তিযুদ্ধ' আমরা তো তখন অতি নিকট থেকেও প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আর তাদের নেতা শেখ মুজিব তখন স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী অঞ্চলে (শুনেছি, সেখানে জামাই আদরে থেকে) কি কি 'মহৎ কর্ম' সাধন করেছিলেন, ইতিহাসের সত্যরূপে তা-ও আজ ক্রমেই প্রকাশ হচ্ছে। শেখ মুজিব তাঁর তখনকার সমগ্র মনমানসিকতাকে দিয়েই পাকিস্তানী হানাদারদের পক্ষের লোক হয়েছিলেন। বিগত ১৯৭২ সালের জুন-জুলাইয়ের চার দিনব্যাপী ভারতের সিমানায় ইন্দিরা-ভূট্টো শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পাকিস্তানের ভূট্টোর সঙ্গে সফররত একদল পাকিস্তানী সাংবাদিকের মধ্যে বেশ ক'জন পুরাতন (সাংবাদিক) বন্ধুর সেখানে দেখা সাক্ষাত পেয়েছিলাম, তাদের নিকট হতে একাত্তরের শেখ মুজিবের পাকিস্তানে অবস্থানকালের বহু তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেখ মুজিবের স্বেচ্ছায় তখনকার সহযোগিতামূলক আচরণের সেসবের বহু তথ্যই আজ প্রকাশ হয়েছে। সেই একাত্তরেই দিল্লী সরকার মওলানা ভাসানীকে সেখানে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। পাকিস্তান সরকার একাত্তরে সে রকম আচরণও নাকি শেখ মুজিবের সঙ্গে করেনি। যতটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তার ব্যবস্থা করেই পাকিস্তানে তখন শেখ মুজিবকে তাদের নিজেদের লোক মনে করেই নাকি সেখানে রাখা হয়েছিল, ওদের মুখে শুনেছিলাম।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক ছিলেন না। আর তাই তাঁর পক্ষের সত্য তথ্যকে আজ তার পক্ষের লোকজনের তুলে ধরবার কোনো উপায় নেই। সেজন্য ওরা অজস্র নব নব সথ্য-মিথ্যা বানোয়াট করা তথ্য তুলে ধরে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিকৃতকরণের পথ ধরেছেন।

আজকের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতকরণের অসাধ্য পথটি ধরেছেন, কিন্তু কোন মিথ্যাই, শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের ধোপে টিকতে পারছে না।

বিগত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাঝে তাতে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকালটি হতেই এযাবৎকাল বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত নামক দেশটির সরকারের (সেখানকার সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ও বেসরকারি আনন্দ

বাজারীদের ন্যায় সংস্থাসমূহের) বিপুল অর্থ সাহায্যপুষ্ট আওয়ামী প্রচারকেও আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালটিতেই ভারতের ইন্দিরা সরকারের অর্থ সাহায্যপুষ্ট স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের লেখালেখিকে উৎসাহিত করে প্রকাশনা ব্যবসা শুরুর নামে তখনকার পাকিস্তানে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধারূপে ভাবমূর্তিটিকে জোরেশোরে গড়ে তোলবার প্রচার শুরু হয়েছিল দেখেছি।

চলমান বাংলাদেশে বিদেশী সম্প্রসারণবাদী শক্তির সেসব প্রচারের জের ধরেই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে আজও যেন আরেক নব উৎসাহের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাসটিকেই পুরোপুরিভাবে বিকৃতকরণের পথ ধরে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। নব প্রজন্মের বাংলাদেশী তরুণ-যুবকসহ এদেশের সহজ সরল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার এসব আওয়ামী প্রয়াস, যা অচিরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়।

ইতিহাসের পরস্পর বিরোধী তথ্য নিজ নিজ বক্তৃতা ভাষণে লেখালেখিতে বানোয়াট করে তুলে ধরে আওয়ামী বলয়ের ইতিহাস বিকৃতকরণের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাসের সত্যের অমোঘ গতিধারাতে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেও যথার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে রেকর্ডবদ্ধ হয়ে থাকতে দেখা যাবে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রকৃত তথ্যরূপে আজও তা তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছি যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকালের মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রটিকে এর পর হতে দীর্ঘ দিনের ভারতে ইংরেজ-বাবু শ্রেণীটির শত প্রচারেও চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আমাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালের সেভাবে শেখ মুজিবের একই চরিত্রের কর্মকাণ্ডকেও সীমান্ত পারের বাবু শ্রেণীটির সহযোগিতায় এদেশে আওয়ামী প্রচার দিয়ে আর চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। একাত্তরের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের পালিত ভূমিকা ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধকালের মীরজাফরের চেয়ে উন্নততর ছিল না। ইতিহাসের যথার্থ বিবরণে এ-কথাটিই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

একাত্তরের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একজন মহান মুক্তিযোদ্ধারূপে নয়– এতে মীরজাফররূপেই তাদের নেতা শেখ মুজিব অন্তর্গত হবেন এবং তা ঢেকে রাখবার প্রয়াসেই আজকের শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকরণের প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছেন।

শেষের কথা

বিগত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একচ্ছত্র বাকশালী রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের মর্মান্তিক পতন ঘটেছে। তার পরে তাঁর আওয়ামী লীগ দলীয় খন্দকার মোশতাক আহমদসহ অন্যান্য সদস্যদের হাতে আর বেশিদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ক'দিন পর উক্ত পঁচাত্তর সালেরই ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার মহান বিপ্লব একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতার গদীতে বসিয়েছিল। বাংলাদেশী জাতিকে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস তখন ফেলতে দেখা গিয়েছিল।

ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতকতা– ইতিহাসকে নিয়ে মশকরা বেশিদিন চলে না। বাংলাদেশী জাতি শেখ মুজিবকে একদিন নিজেদের অন্তরের উজার করা ভালবাসা দিয়েছিল। আর অনতিবিলম্বে তাঁর মর্মান্তিক পতনে এদেশের সেই সর্বসাধারণই তাঁর জন্য একটি সহানুভূতির বাণীও উচ্চারণ করেনি। এদেশের গণতন্ত্রের লক্ষ্যে লড়াইরত সাধারণ লড়াকু মানুষ তাঁর ক্ষমতায় যাবার পথকে সুগম করেছিল। ক্ষমতায় বসেই তা একচ্ছত্র-কুক্ষিগত করবার চিন্তা-চেতনাকে তখন তিনি যেন উসকে দেবার মতো নিজের চারপাশে এক গণবিরোধী পরিবেশকে নিজেই সৃষ্টি করলেন। তখনকার দিনে দেশ-বিদেশ থেকে আগত লেখক-সাংবাদিক ইতিহাসবিদদের প্রায় সবাইকে শেখ মুজিবের ঢাকাই সরকারি শাসনের সেসব দৃশ্য দেখে লিখে যেতে হয়েছে। মধ্যযুগীয় মোগল দরবারের মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ঢাকায় অভিজাত দরবারে বসতেন। তাঁর পরিবারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভাগনেদের অবাধ যথেচ্ছাচারের কাহিনী দেশ-বিদেশে সর্বত্র লিখে প্রচারিত হতেও দেখা গিয়েছিল। রাজা-মহারাজা সম্রাটদের মতো তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পরিবারের সদস্যদের উত্তরাধিকারত্ব বজায় রাখবার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। দেশের সামরিক বাহিনীতে নিজ পরিবারের কর্তৃত্ব

কায়েমের উদ্দেশ্যে পুত্র শেখ জামালকে বিলেতের বিখ্যাত স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী একাডেমী থেকে রাষ্ট্রীয় খরচে সামরিক ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে এলেন।

এসবের কোন শেখ মুজিবকে ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেদিনের মনি সিং প্রমুখ মস্কোপন্থীদের এক 'ইতিহাসের চাকা বিপরীত মুখে ঘুরান'র কুপরামর্শকে শেখ মুজিব বাস্তবায়িত করলেন। একচ্ছত্র বাকশালী ক্ষমতা গ্রহণের মোহে পড়ে শেখ মুজিব পঁচাত্তরের সূচনাতেই উপরোক্তদের পরামর্শে বাকশালী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। নিজের শাসনের মর্মান্তিক পতনের ডংকা তিনি নিজেই বাজিয়ে দিলেন।

ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ঘোরানো যায় না। গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী ইতিহাসের উল্টোমুখীন শাসন প্রতিষ্ঠার অপরাধ করে শেখ মুজিব ইতিহাসের যথাযথ শাস্তি ভোগ করেছেন।

বিগত ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব পরবর্তী ডিসেম্বরের এক সময়কাল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তখন বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী হতে আগত নেতা জিয়াউর রহমানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা তখন দেশের অন্যান্য সমস্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক সাথে স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারছি। এক সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে মানুষ তখন রাতের নিদ্রাকেও যেন উপভোগ করতে শুরু করেছে।

নিজেদের আমাদের দীর্ঘ সময়কালের সংবাদপত্রে লেখালেখির সাংবাদিকতার খুঁতখুঁতে স্বভাবকে তখনও আমরা ছাড়তে পারিনি। ঢাকা থেকে একদিন শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে টাঙ্গাইল সন্তোষে নিজ গৃহে অসুস্থ শয্যাশায়ী মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে এলাম। তখন তাঁর সম্মুখে নিজেদের সেই খুঁতখুঁতে স্বভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম ঃ 'সামরিক বাহিনী থেকে এসে একজন লোক (জিয়া) দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে কতটা কি করতে পারবেন ?'

তখন মওলানা ভাসানী দ্বিধাহীন পরিস্কার কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন ঃ 'এই লোকটির (জিয়ার) দিকে লক্ষ্য করে দেখবে, আমি নিজে এর সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী।'

তার অনতিকাল পরেই ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর শতাব্দীর সূর্য মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পরলোক গমন করেন। মহান নেতার নির্দেশ আমরা ভুলিনি। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের আমলকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি নেতা মওলানা ভাসানীর ভবিষ্যত-কথন কতটা সঠিক ছিল। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের দুঃশাসন পরবর্তী সময়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তাঁর স্বল্পকালীন সুশাসনের যেন এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখেই গেছেন। কৃতজ্ঞ বাংলাদেশী জাতি দীর্ঘকাল তা মনে রেখেছে।

ইতিহাসের চাকাকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে আরেকবার পিছনের দিকে ঘোরাবার অপপ্রয়াস ঘটেছে। শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের এবার নতুন কর্নধাররূপে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবেশের সূচনা মুহূর্তে জেনারেল এরশাদকে তাঁর সামরিক স্বৈরশাসনকে নিয়ে তারা গদীতে বসতে দেখলেন। শেখ হাসিনার আওয়ামী বলয়টিকে তা বিশেষ উল্লসিত করে তুলেছিল। এরশাদের সেই ইতিহাসের চাকাকে উল্টোমুখীন ঘোরানোর প্রয়াসে শেখ হাসিনার আওয়ামী বলয়টির অতি উৎসাহের সঙ্গে মদদ প্রদানে দেশবাসী তখনও লক্ষ্য করেছেন। দেশের পত্র-পত্রিকাতেও এসবের মুদ্রিত রেকর্ড রয়েছে।

গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের অগ্রসৈনিক এদেশের সাধারণ মানুষ। বিদেশী সেবাদাস শ্রেণীর রাজনীতিক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশে দেশদ্রোহকর বিষয়াদি প্রচাররত পত্র-পত্রিকার শত সহস্র লেখালেখির হট্টগোল দিয়েও এদেশের সাধারণ দেশপ্রেমিক জনগণকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। বিগত ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনী ফলাফলে এর আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। উপরোক্ত কুচক্রটির সর্বপ্রকারের চক্রান্তকে এদেশের গণতন্ত্রমনস্ক সাধারণ মানুষ ব্যর্থ করে দিয়েছে। কুচক্রটির শত সোচ্চার প্রচার ধারাটি ব্যর্থ হয়েছে, আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার বিদেশী মদদে গদী দখলের আরেকটি প্রয়াস তখন ব্যর্থ হয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার যোগ্য উত্তরসুরী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণ

নিজেদের ভোটে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জয়যুক্ত করেছে। আরেকবার বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিজয় অর্জিত হয়েছে।

ইতিহাসকে পরাজিত শক্তিটির মিথ্যা প্রচারমূলক বিষয়াদি দিয়ে বিকৃতকরণের আগের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত পার হতে স্রোতের গতিতে আগত ঘুষের অর্থ সম্পদের সহায়তার বলে বাংলাদেশে আওয়ামী বলয়ভুক্ত চক্রটি বলীয়ান হয়ে এক ভূয়া স্বাধীনতার চেতনা– মুক্তিযুদ্ধের মিথ্যা করে চেতনার জারীগান জুড়ে বাংলাদেশী জাতিটির মাঝে বিভেদ-বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটানা প্রয়াস আজ যেন বেড়েই চলেছে। সচেতন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী জাতিটিকে বিভ্রান্ত করবার এসব প্রয়াস, আওয়ামী বলয়টির এসব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকরণের প্রয়াস বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশপ্রেমিক জনগণ আগের মতোই ব্যর্থ করে দেবেন।

বাংলাদেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক ভোট প্রদানের অধিকারকে যতদিন ধরে রাখতে সক্ষম হবে, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয়যাত্রাকে শত চক্রান্তেও রুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট গোলাম মহিউদ্দিনের জন্ম ১৯৩২ সালের ৩০ জুন জলপাইগুড়ির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন বগুড়ার বিশিষ্ট আইনজীবী খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং পরবর্তীকালে জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা। মেধাবী ছাত্র গোলাম মহিউদ্দিনের শিক্ষা জীবন কাটে বগুড়া জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী গ্রহণের পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ (তদানীন্তন পাকিস্তান) অবজারভার পত্রিকায়। দীর্ঘদিন সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসেবে তিনি অবজারভার-এ কর্মরত থাকা ছাড়াও পাকিস্তান আমলের এ. পি. পি.-র দিল্লী প্রতিনিধি হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে দীর্ঘদিন তিনি সাপ্তাহিক নওবেলাল, দৈনিক আজাদ, করাচীর দৈনিক ডন প্রভৃতি পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখতেন।

ছাত্র বয়সেই গোলাম মহিউদ্দিন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন বগুড়া জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম. পরিষদের আহ্বায়ক। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে ৯২ ক ধারা জারী হলে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা, কলিকাতা, দিল্লী ও রাওয়ালপিন্ডিতে বাস করেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৭২ সালে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'পিন্ডির ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থ সুধীমহলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। গোলাম মহিউদ্দিন ১৯৯৬ সালের ১৭ নভেম্বর বগুড়ায় ইন্তেকাল করেন।

প্রচ্ছদ : সুব্রত সাহা